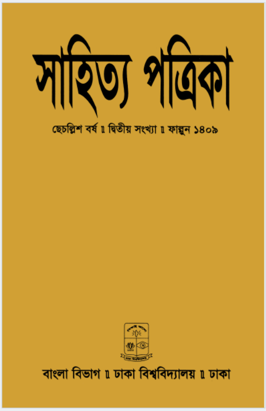

Vol. 46 | No. 2 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা-ভাষার উতপত্তি-নির্দেশক ‘ভাষা-প্রকল্প’ ও ‘যুগ-বিভাগে’র যৌক্তিকতা

Volume	46
Issue	2
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. লুৎফর রহ্মান
Published online	February 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i2.336
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i2.336
Pages	৫-৮৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাঙালা-ভাষার উৎপত্তি-নির্দেশক 'ভাষা-প্রকল্প' ও 'যুগ-বিভাগে'র যৌক্তিকতা

ড. এস. এম. লুৎফর রহ্মান

১.

বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর ডিগ্রীওয়ালা ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন; দুনিয়ার তাবৎ ভাষা-কওমের (ভাষা-গোষ্ঠীর) পয়দা হ'য়েছে—'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা' নামক কোন এক ভাষা থেকে। বলা দরকার, এটি একটি কাল্পনিক ভাষা-প্রকল্পের নাম। আজকের আমেরিকান-বিশ্বায়নের মত ১৮-১৯ শতকের বৃটিশ-বিশ্বায়নের স্বার্থে একটা আন্তর্জাতিক কালাচারাল ফাউণ্ডেশন তৈরীর প্রয়োজনেই সেকালে এই ভাষা-প্রকল্প গ'ড়ে তোলা হয়; যার ভিত্তিতে এখন টান প'ড়েছে। কেননা, "ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষা"- প্রকল্পটাই কাল্পনিক। তা চালু হয়, ইউরোপীয়দের দিয়ে 'ইন্দোস্তান' (Indoostan) বা হিন্দুস্তান (যা পরে, আরও ব'দলে হিন্দুয়া বা হিন্দিয়া থেকে ইণ্ডিয়া রূপ ধারণ করে এবং এখন সে মুল্লুক 'ভারত' নামে পরিচিত) কব্জা করার পর। ১৮-১৯ শতকে। নামের মধ্যেই যে, একটা চোস্ত দোস্তি পাতাবার কুস্তি-কোশেশ আছে, তা একটু খেয়াল ক'রলেই বোঝা যায়। এজন্য আগে 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা'–যাকে ইংরেজীতে 'ইন্দো-ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পীচ্' (Indo-European Parent Speech) বলা হয়, তার অর্থ ও তাৎপর্য বোঝা দরকার।

১.১ 'ইন্দো-ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পীচ্'

'ইন্দো' অর্থ 'হিন্দুস্তানী'; আধুনিক পরিচয়ে 'ভারতীয়'। আর 'ইউরোপীয়'

* প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শব্দটার তফ্‌ছির (ব্যাখ্যা) না ক'রলেও বুঝতে কারো তক্‌লিফ হবার কথা নয়। তাই 'ইন্দো-ইউরোপীয়' কথাটার অর্থ হ'ল— 'ভারতীয়- ইউরোপীয়' মূল ভাষা। ইংরেজীতে এভাষা-দু'টো মিলিয়ে 'Indo-European Parent Speceh' বলা হয়—তা আগেই বলা হ'য়েছে। সবাই জানেন—'প্যারেন্ট' অর্থ আব্বা-আম্মা বা বাবা-মা। অথচ একথা কেউ আজ তক বলেননি যে, এই 'বাবা-মা'র জোড়বাঁধা ভাষার 'বাবা' কে, আর 'মা'-ই বা কে? সবাই জানেন, জমজ সন্তানেরও বাবা এবং মা আলাদা আলাদা দেহধারী হ'য়ে থাকেন। তাহ'লে, ঐ ইন্দো-ইউরোপীয়ান মূল ভাষাটার 'বাবা ইণ্ডিয়ান—মা ইউরোপীয়ান'; না, 'মা ইণ্ডিয়ান—বাবা ইউরোপীয়ান'? কোন্‌টা ঠিক্? তা আজ তক কেউ বলেননি। এ-বাহাছ কেউ তোলেননি।

অনেকেই জানেন, এই তত্ত্ব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মগজে পহেলা মউজ (ঢেউ) তোলে। ভারতে যে-সব ইউরোপীয় বিদ্বান—উপনিবেশবাদী-দখলদারিত্ব পাকাপোক্ত করার জন্য এদেশের শিক্ষিত লোকদের মগজ ধোলাই ক'রে মাথা কিনতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হ্যালহেড, উইলিয়ম জোন্‌স, ওগয়রহের কথা ব'লতেই হয়। তাঁরা তখন হিন্দুস্তান উপমহাদেশের মালিক। ইউরোপীয়রা তখন এ-দেশী অমুছলমানদের নিকট কেবল 'পুরুষ' নয় 'পুরুষোত্তম'। আর এক শ্রেণীর ইন্দোসন্তান তো তখন এঁদের 'চরণদাসী'। ফলে, ইংরেজ আলেমরা নিশ্চয়-ই 'মূল ভাষা'টার 'বাবা ইউরোপীয়' আর 'মা ভারতীয়' ঠাউরেছেন। তা কবুল ক'রে নিয়েছেন—ভারতীয় পণ্ডিতরাও। কে'না, সে-ধারণা তাদের ধর্মতত্ত্বের সাথে বেশ খাপ খায়। সারা হিন্দুস্তান উপমহাদেশের পনের আনা বামুন-ই তান্ত্রিক বা 'শক্তি সাধক'। এই শক্তি, আদ্যাশক্তি বা কালিকা দেবী। তাঁদের মতে, হরফ (ভাষা) হ'ল—আদ্যা শক্তির এক বিশেষ রূপের নজীর। ফি-হরফ হ'ল—'শক্তি'র এক একটি বিশেষ রূপ। আবার গোটা 'ভাষা'টাও ঐ দেবীর আর এক কিছিমের রূপ। এই দু'রকম চেহারায় হরফ হ'ল—'শাক্ত'দের মতে, অক্ষরমাতৃকা বা 'অক্ষর-মাতা'; আর 'ভাষা' হ'ল—ভাষামাতৃকা বা 'ভাষা-মাতা'। যাকে ভুল অর্থে, সাধারণ লোকে 'মাতৃভাষা' বা 'মায়ের ভাষা' বলে। ধর্মের দিক থেকে খৃষ্টানরা পিতৃ-(যিশু) উপাসক; আর হিন্দুস্তানী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণরা মাতৃ-উপাসক। অতএব, এই রায় বেশক দেয়া যায় যে, ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাটা পয়দা হয়—ইউরোপীয় পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে।

বিশ্ব-ভাষারাজির একক উৎস সম্পর্কে ইউরোপীয় আলেমদের এই কল্প-কথা, তাদের ঐ আমলে কায়েম করা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের তরফে বেশ মূল্যবান

অবদান রাখে। বিশ শতকের পয়লা দশকে এদেশের লোকে বলাবলি ক'রত—'বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'। অতএব, আজকের মার্কিন-বিশ্বায়নের সমর্থনে গলদ্‌ঘর্ম মহা মোসাহেবদের নানা কিছিমের তত্ত্ব-প্রচারের মতই যে, সে-আমলে (১৯-২০শতকে) বৃটিশ-বিশ্বায়ন তথা ইউরোপীয় বিশ্বায়নের উপযোগী একক দম্পতির একটা ভাষা-তত্ত্ব জাহির করার দরকার ছিল—তা চিন্তা করা স্বাভাবিক । আর সেটাই করা হয়। ফলে, 'মা-ভাষা'-ই হোক, অথবা আধুনিক সিম্বল অনুযায়ী ভাষা-বৃক্ষের মূল-ই হোক; ঐ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা পরিকল্পনা যে, একটা বিশাল চাতুরী, তা অন্য তথ্য দিয়েও প্রমাণ করা যায়। তবে তার আগে দেখা দরকার—হিন্দুস্তানী আর ইউরোপীয় মা-বাবা, দম্পতি রূপে কবে কোথায় এক সাথে ঘর ক'রত? তার অর্থ—মূল আর্য্য ভূমি কোথায়? আদি আর্য্য কারা—কোন্ জন-কওম। আর "আর্য্য" শব্দটাই বা কত পুরানো।

ক) "আর্য্য" শব্দের প্রাচীনত্ব

আধুনিক গবেষকগণের লেখা থেকে জানা যায়—"আর্য্য" শব্দ খুব প্রাচীন নয়। পুরানো ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি ক'রতে গিয়ে ভারতীয় ইতিহাস-গবেষক জনাব গোলাম আহ্‌মাদ মোর্তজা লিখেছেন—"আর্য্য শব্দটা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্টি হ'য়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে । তবে সেই শব্দটি আর্য ছিল না বরং ছিল আর্যাবর্ত। সে যাই হোক কল্পিত ঐ মূল ভাষা (আর্য্য ভাষা) এবং সেই ভাষাভাষীদের আর্য্য (আর্য্য জাতি) ব'লে জানানো হ'য়েছিল উনিশ শতকে প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটির পত্র-পত্রিকায়।"

অপর দিকে, ইউরো-আমেরিকান লেখকদের রচনা থেকে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী উইলিয়ম সি বয়েড, 'জেনেটিক্‌স অ্যাণ্ড দি রেসেস অব্ ম্যান' বইয়ে লিখেছেন—"The term "Aryan" was introduced into modern usage by Professor Max Mueller, a German philologist who went to England and remained there the rest of his life" (P. 184)। এই জার্মান পণ্ডিত সারা জীবন কাটিয়েছেন লণ্ডন। জীবনে একবারও ভারতে না এসে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণগর্বীদের জন্য আর্য্য রক্ত, আর্য জাতি, 'আর্যভাষা' ও আর্য সভ্যতার, ফ্যানাটিসিজম্ তৈরীতে কি বিশাল ভূমিকা রেখে গিয়েছেন—তা ভাবলেও অবাক হ'তে হয়। তার ঐ ভূমিকার পরিণাম সম্পর্কে ডব্লিউ সি. বয়েড লিখেছেন—"The term, however, once released proved to be a veritable monster of Frankenstein, and the monster has not yet been destroyed. Our generation, and perhaps still

others to come, will have to pay with blood and tears for the delusions which resulted from its misuse" (P. 184-'85)।

ম্যাক্স মূলারকে উপহাস ক'রে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন—

"মোক্ষমূলার ব'লেছে আর্য্য
তাই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য
মোরা বড় ব'লে ক'রেছি ধার্য
আরামে পড়েছি শুয়ে॥"

অতএব, "আর্য্য" শব্দটা যে আদৌ প্রাচীন কোন শব্দ নয়—তা পষ্ট।

খ) 'আর্য্য'-ভূমির সন্ধান

এবার দেখা দরকার, প্রাচীন আর্য্য-ভূমি কোথায়? এশিয়ায়—না ইউরোপে? ভারতে—না আরবে? না 'অন্য কোথাও, অন্য কোন খানে'।

অনেকেই জানেন, প্রাচীন 'আর্য্য-ভূমি' নিয়ে মতভেদ র'য়েছে। কেউ বলেন—আর্য্যদের আদি বাসভূমি ইউরোপে।' কেউ বলেন—আদি আর্য্যরা উত্তর ইউরোপের অধিবাসী। বিশেষ ক'রে উত্তর জার্মানীতে ছিল—তাঁদের আদি বসবাস। কেউ বলেন—না, মধ্য ইউরোপেই ছিল তাদের বাস-বসতি। অ্যালপাইন পার্বত্য এলাকায় ছিল তাদের আদি ঠিকানা। আর কেউ বলেন—তা হবে কেন:—দক্ষিণ ইউরোপ-ই ছিল—আদি আর্য্যভূমি। যাকে ইংরেজীতে mediterranean (ভূমধ্য সাগরীয়) এলাকা বলা হয়। আবার কারও মতে—আদি আর্য্যভূমি—মধ্য এশিয়ায়। মতান্তরে—তা, ভারতে।

অতএব, আজ তক মূল 'আর্য্য-ভূমি' কোন্‌টা, তা ঠিক ঠিক বলে ওঠা সম্ভব হয়নি। বিষয়টা নিয়ে পরে আরও আলোচনা করা হবে।

গ) 'আর্য্য-জাতি'র পরিচয়

আর্য্যভূমির হদিছ পাওয়া না গেলেও, এবার আর্য্য-জাতির পাত্তা পাওয়া যায় কিনা—দেখা দরকার।

তবে এ-তরফেও নতুন কিছু বলার সুযোগ নেই। কারণ 'জায়গা' দিয়ে 'জাতি' চিহ্নিত হয়। জায়গার নামে—'জাতির নাম' রাখা হয়। সে-বিচারে যারা উত্তর ইউরোপে 'আর্য্য-ভূমি' অবস্থিত ব'লে মনে করেন; তাঁরা উত্তর জার্মানীর

প্রাচীন অধিবাসীদের-ই 'আদি আর্য্য' ব'লে মনে করেন। তাঁরা ঐ জনকওমের নাম দিয়েছেন—"নর্ডিক"। শব্দটি ইংরেজী 'নর্থ'-এর জার্মান প্রতিশব্দ—'নর্ড'। আর যাঁরা মধ্য ইউরোপ-ই আর্য্য-ভূমি ব'লে দাবী করেন—তাঁদের মতে এখানকার আল্পস-পর্বতমালায় বসবাসকারী প্রাচীন লোকজন-ই 'আদি আর্য্য'। তাঁরা তাঁদের জাতি-নাম দিয়েছেন—"অ্যালপাইন'। এ-এলাকা সুইজারল্যাণ্ডে। আর যারা দক্ষিণ ইউরোপকে আর্য্য-ভূমি ব'লে ভাবেন—তাঁদের মতে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার প্রাচীন লোকেরাই—'আদি আর্য্য'। বলা দরকার যে, ১৭৮৬ সালে ভারতে "আর্য্য", "আর্য্যাবর্ত" শব্দ চালুর পর, বর্ণ-বৈষম্যবাদী ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ্ সি.ডি. গোবিনিউ, তাঁর 'এসে অন দি ইনইকুয়ালিটি অব্ রেসেস'-(১৮৫৩-'৫৫র মধ্যে লিখিত) গ্রন্থে বিশ্বের গোটা মানব জাতিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন। তা হ'ল—শ্বেত, পীত ও কালো। তার মতে, এই তিন জাতির মানুষের মাঝে—"Blond, blue-eyed, tall, energetic long- headed" 'নর্ডিক'রাই হ'ল—"the last remnant of the Aryans."

কিন্তু তাঁর বক্তব্য মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যান তন্ন তন্ন ক'রে আলোচনা করার পর বাতিল ক'রে দিয়েছেন। এক-ই ভাবে তাঁরা লিনিয়াস্, (Linnaeus) ব্লুমেনবাখ (Blumenbach), হেকেল (Haeckel), কুন (Coon), চেম্বারলেইন (Chamberlain), গোবিনিউ (Comte de Gobineau) ওগয়রহের শ্বেতাঙ্গবাদী 'আর্য্যজাতি'-ধারণাকেও নাকচ ক'রে দিয়েছেন (P. 87-94)।

এ-তরফে আরও বলা দরকার যে, নর্ডিক, অ্যালপাইন, মেডিট্রানিয়ান জনকওমও একক, অমিশ্র কোন জনকওম নয়। ঐ তিনটা নামের সাথে তাই "নর্ডিক অ্যালপাইন" ও "নর্ডিক মেডিট্রানিয়ান" জাতির লোকদেরও মোলাকাৎ মেলে।

এমনকি, খোদ জার্মানীতেও মাত্র তিন কিছিমের নয়, ছ'কিছিমের জনকওম র'য়েছে।

ফলে—১৮,১৯ ও ২০ শতকের যে-সব ভারতীয় ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণগর্বী ব্যক্তি, নিজেদের 'আর্য্য জাতি' ব'লে দাবী ক'রে আসছেন—তাঁরা প'ড়েছেন—মহা ফ্যাছাদে। তাঁরাও কেউ বলেন—প্রাচীন আর্য্যরা নর্ডিক; কেউ বলেন—অ্যালপাইন। আবার কেউ বলেন—ভারতের আর্যাবর্তের লোকেরাই আদি আর্য্য-জাতি। কিন্তু এ-তত্ত্ব এখন আর সবাই মানতে রাজি নন। তাই গোটা

বিষয়টাকে রিডিকুল ক'রে ভারতীয় লেখক বিবশ্বান বাবু—তাঁর 'মিথ্যাময় ইতিবৃত্তে' লিখেছেন—"এক দল ব'ললেন—আর্য্যরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন; ত' আর একদল ব'ললেন, ওঁরা ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড থেকেই এসেছিলেন।"... (তারপর) "কিছু ভারতীয় পণ্ডিত উল্টো এক তত্ত্ব দিয়ে ব'সলেন। তাঁরা ব'ললেন; 'আর্য্যরা বিদেশ থেকে ভারতে আসেননি; ভারত থেকেই তাঁরা বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন।' আজগুবি 'তত্ত্ব'কে উল্টে দিলেও যে, আর এক আজগুবি কাণ্ড তৈরী হয়—এটাই তাঁরা বোঝেননি।"

কাজেই যে-ভারতে 'আর্য্য' শব্দ পয়দা এবং যেখান থেকে ইউরো-আমেরিকান পণ্ডিতরা এই কাল্পনিক জাতি-ধারণা (ভাষা-ভূমিসহ) পেয়েছেন—সেই ভারতেই 'আর্য্য-ভূমি', 'আর্য্য-জাতির' কোন পষ্ট ধারণা নেই।

ঘ) **আর্য্য-ভাষা পরিচয়**

এবার 'আর্য্য-ভাষা'র পরিচয় নেয়া জরুরী। এ-তরফে পহেলাই বলা ভাল, যে-ম্যাক্সমূলার ও তাঁর অনুরাগী-অনুসারীরা বর্ণবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাজিবাদ, ইয়াংকিবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ-এর ওয়ালেদ সেই ম্যাক্সমূলার গোটা বিষয়টা নিয়ে শেষমেশ কি ব'লে গিয়েছেন—তা জানা দরকার। তাঁর উত্তর-কালের চিন্তা-ভাবনার পরিচয় দিতে ডব্লিউ সি. বয়েড লিখেছেন—"Later he energetically rejected the idea that it was proper to give the term any racial implications, and insisted that it should be applied only to a certain group of languages (the group includes Latin, Greek , Sanscrit, Slavic, etc.)". (P.184)। থ' মারার মত কথা বটে!

অতএব, 'আর্য্য-ভূমি', 'আর্য্য-জাতি'র সব বাহাছ বাদ রেখে, এবার মূল 'আর্য্য ভাষা' ও তার 'অলি-আওলাদ'-এর খোঁজ-খবর নেয়া ভিন্ন গতি নেই।

বলা দরকার যে, "আর্য্য" শব্দটা ভারতে ব'সে বানানো ইংরেজ-কীর্তি। 'আর্য্য-ভাষা'র কথাটাও ইউরোপ-আমেরিকা জেনেছে আঠারো শতকীয় বৃটিশ ভারতের কাছ থেকেই। সে-বিষয়ে নৃবিজ্ঞানী ক্রোয়বার জানিয়েছেন—"The Vedic Indians or—"Aryas" are first known to us from their hymns, the Vedas which have been preserved as sacrosanct by succeeding ages and constitute the oldest continuously transmitted oral documents in history. They date from perhaps

1500 to 1000 B.C; and are in a form of Sanskrit"... (P. 749) তাহ'লে 'সংস্কৃত ভাষা'ই যে 'আর্য্য ভাষা' এবং সংস্কৃত সাহিত্য; তথা বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতেই যে তার পরিচয় নিহিত—তা বেশক বলা যায়। তা হ'লে, আর্য্য-ভাষার তত্ত্ব-তালাসের সূত্রে সংস্কৃত-ভাষার তত্ত্ব-তালাস নেয়াই জরুরী।

ঙ)'সংস্কৃত-ভাষা'র প্রাচীনত্ব

'সংস্কৃত-ভাষা'র প্রাচীনত্ব ও মহিমা প্রচারের জন্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দি অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অব্ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে'র এক জায়গায় লিখেছেন—"ভগবান আর মুনি-ঋষিরা সংস্কৃত ভাষায় কথা ব'লতেন।" (পৃ. ২২) তার কথার ইশারা হ'ল—সংস্কৃত ভাষা বেহেশ্‌তী ভাষা। তা বেহেশতেই পয়দা। এ-ধারণা যে, তিনি মুছলিম-সূত্রে লাভ ক'রেছেন—তা না ব'লে উপায় নেই। কারণ মুছলমানরা বলেন—'বেহেশ্‌তের ভাষা আরবী'।

কিন্তু ধারণাটা যে-সূত্র থেকেই আসুক, তা প্রচার ক'রেছেন—বৃটিশ আমলের কোলকাত্তাই ইঙ্গবঙ্গীয় পণ্ডিতান। কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম-স্বর্গে ব'সে, শ্বেত-অশ্বেত—ব্রহ্মা-বিষ্ণু, ভূত-ভগবান, মহেশ্বররাই যে, আধুনিক কালের 'সংস্কৃত ভাষা'টা তৈরী করেন; সে-কথা খোদ্ ভারতীয়রাই ফাঁস ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা ব'লছেন—"দেশ-বিদেশে বহু জাতি আছে, যাদের ভাষার কোন লিপি সৃষ্টি হয় নি আজও। তবু সেই সব ভাষায় কথা বলার মত মানুষ বিশ্বে বিদ্যমান। যেমন 'হোলি' ভাষায় এখনও (১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবানুযায়ী) ৬৫ হাজার লোক কথা ব'লছে। লিপিহীন বা অক্ষরহীন 'কুমান' ভাষায় কথা ব'লছে ৭০ হাজার লোক। 'মলিপা' ভাষায় কথা ব'লছে ৭৫ হাজার লোক। 'এঙ্গা' ভাষায় কথা ব'লছে ১লাখ ৮০ হাজার লোক । 'কুওয়ানুওয়া' ভাষায় কথা ব'লছে ৮০ হাজার লোক। 'পর' ভাষায় কথা ব'লছে ২৫ হাজার লোক। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কিছু লোক 'ক্রিয়ল' ভাষায় বংশানুক্রমিক কথা ব'লে আসছে, তাদের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার । কিন্তু আশ্চর্যের কথা 'সংস্কৃত' ভাষা নিয়ে ভারতে এত হৈ হৈ রৈ রৈ, অথচ এখানে একটি পরিবার বা সংসার খুঁজে পাওয়া যাবে না—যারা স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে নিজস্ব ভাষা হিসাবে 'সংস্কৃত' ভাষাকে বেছে নিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও সংস্কৃত ভাষার জন্য লিখেছেন—"আমাদের ভাষা—সংস্কৃত, গদাই লস্করী চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হ'চ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়—লক্ষণ। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট। কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক,

কল্পিতমাত্র—তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চ'লতি ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য, গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলায় ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর।...আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ, এখন-ই বুঝতে পারবে যে, **যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়,** ম'রে গেলে মরা ভাষা কয়। শক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু'-একটা পঁচাভাব রাশিকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে সে কি ধুম—**দশ পাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে 'রাজা আসীৎ'!!!! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি** শ্রেয়!!—ও সব মরার লক্ষণ।"

ঐ লেখক আরও জানিয়েছেন—"কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ভারতের নানান ভাষাভাষী পণ্ডিতদের, যে ডাকা হ'য়েছিল এ-খবর ইতিহাসেই পাচ্ছি। ডাকা হ'য়েছিল আঠারো শতকের সাতের ও আটের দশকে। মারাঠী পণ্ডিতদের, গুজরাতি বিদ্বানদের, উড়িয়া বিদগ্ধ-বিদুরদের। অনেকে সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তমলুক মেদনীপুরের করিৎকর্মা (কৃতকর্মনঃ) শিল্পীরা আগে থেকেই ছিলেন। **ইউরোপে ঐ পরিকল্পনায় ল্যাটিন, হিব্রু ও প্রাচীন গ্রীকভাষায় প্রাচীন ব'লে প্রচার করা নানা কেতাব লেখানোর উদ্যোগ-আয়োজন নেওয়া হ'য়েছিল। ভারতে নেওয়া হ'য়েছিল—সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, আরবী, ফারসী কেতাব লেখানোর ব্যবস্থা। সরকারী উদ্যোগে কলকাতা, বনারস, নদীয়া [নবদ্বীপ] ও মিথিলায় গ'ড়ে উঠেছিল সংস্কৃতমাধ্যম মিথ্যা সৃষ্টির আঁতেলি কর্মশালা। বনারস, গাজীপুরে তথাকথিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষার** নেপথ্য কর্মকাণ্ডও চ'লেছিল।" (পৃষ্ঠা৩৪-৩৫)।

তিনি আরও ব'লেছেন—'সংস্কৃত' ভাষা ব'লে যেটি বর্তমানে প্রচলিত, ঐ ভাষায় দূরদর্শনের খবর প্রচার, নাটক, গান ছাড়াও ঐ ভাষায এম. এ. এবং ডক্টরেটও করা হ'চ্ছে। সংস্কৃত নিয়ে কত কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বাঘা বাঘা অধ্যাপকেরা গবেষণা ক'রছেন। রাজনীতিবিদ্‌রা চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয় ঐ সংস্কৃত ভাষা। একদল লোক নিজেদের বুদ্ধিমান মনে ক'রে সংস্কৃত ভাষাকে ব'লে থাকেন—'মৃত ভাষা'। আবার একদলের মতে তাঁরা বুদ্ধিমান-ই নন। **যে ভাষার অস্তিত্বই ছিল না, সেই ভাষার মৃত্যু ঘটে কিভাবে? যত নিকৃষ্টতম ভাষাই হোক, যত দুর্বলতম ভাষাই হোক, সেই ভাষায় কথা বলারমত সংখ্যালঘু হ'য়েও একটা সম্প্রদায় থাকবেই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা কোন দেশে,কোন প্রদেশে, কোন জেলায়, কোন থানায়, কোন গ্রামে বা কোন একটি পরিবারেও ব্যবহৃত ভাষা নয়। এটা কি সাহেবদের সৃষ্টি করা আন্তর্জাতিক একটা**

ধাঁধাঁ নয়? দেহ এবং প্রাণের যেমন সম্পর্ক একটি জাতি ও তার ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক তেমনি। একটি মৃতদেহ দেখলে অবশ্যই অনুমান করা যাবে অতীতে তার প্রাণ ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, বলা যায় না যে একদিন তার দেহ ছিল।"

ভারতের অপর গবেষক শ্রীআর্য তাই লিখেছেন—**"আসলে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, পর্তুগীজ, বুলগেরীয় ইত্যাদি ইউরোপীয় নানান ভাষার শব্দই ঐ সংস্কৃত ভাষায় রাখা হ'য়েছে। রাখা হ'য়েছে ল্যাটিন, গ্রীক শব্দও। রাখা হ'য়েছে আরবী, ফারসী শব্দের আদলে তৈরী ক'রে নেওয়া শব্দও।"** উত্তর প্রদেশের বনারস আর গাজীপুর জায়গাদুটোকে সংস্কৃত সাজানো ছদ্মবেশে বারানসী ও গর্জতীপুর ব'লে চালান হ'ল।

যশোর জেলার কালিয়া ও ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া থেকে বাছাই করা বেশ কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল ঐ বনারস আর গাজীপুরে। নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল ওঁদের দিয়ে বেদ লেখানোর কাজটা করিয়ে নিতে। এঁদের সঙ্গে বেশ কিছু মারাঠী, গুজরাতী, ভোজপুরী ও মৈথিলী সাকরেদও ছিলেন। সাকরেদ ছিলেন বাংলা ভাষী নানান জেলা থেকে পাঠানো কিছু পণ্ডিতও। এঁদের যৌথ প্রয়াসে গোপনীয়তম পরিমণ্ডল রচনা ক'রেই বৈদিক বুজরুকি লেখা শুরু হ'য়েছিল।.....

কালিয়া–কোটালিপাড়া থেকে যে-সব পণ্ডিতকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল তাঁদের কেউ-ই যশোর বা ফরিদপুর জেলার আদি বাসিন্দা ছিলেন না। এঁদের সকলের-ই আদি বাসস্থান ছিল মেদনীপুর [সংস্কৃত ছদ্মবেশে মেদিনীপুর] জেলার তমলুকে। সংস্কৃত নামক 'দেবভাষা' সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও নেপথ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনায় করিৎকর্মার [কৃতকর্মণঃ] পরিচয় দিয়ে তমলুক-মেদিনীপুরের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৌজন্যে যশোর, ফরিদপুরসহ নানান জেলায় প্রচুর জমির মালিক হ'য়ে ব'সেছিলেন।"

এ-রকম **'সংস্কৃত ভাষা'র ছাঁচে ঢেলে** 'আর্য্য-লিপি' ও 'আর্য্য-ভাষা' তৈরীর এই নেপথ্য-কথা মনে রেখে, এবার আর্য্য-সাহিত্যের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে—তাহ'লে আরও অনেক অবাক করা তথ্যের মোলাকাৎ মিলবে।

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও তার রূপ

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষাই আদি আর্য্য-ভাষা। কিন্তু এ-ভাষা যেহেতু আরও কয়েকটা পুরানো ভাষার আদলে-নকলে চোরা-উপাদান দিয়ে, গ'ড়ে তোলা হ'য়েছে, সে-জন্যে ক্রোয়বার প্রমুখ ব'লতে বাধ্য হ'য়েছেন—"--- Sanskrit, which is fairly close to Avestan or Old Persian; the two languages jointly with their descendants constitute the Indo-Iranian or proper Aryan brance of Indo-European." (P.749).

অতঃপর ইরানী আলেম প্রফেসর ড. পি.এন. খানলারি—তাঁর "A, History of Persian language"-গ্রন্থে ইন্দো-আর্য্য বা ভারতীয় সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"The oldest records available in the Indo-Aryan are the Vedas composed in Sanskrit. It is difficult to ascertain the exact date of the Vedic texts. The religious hymns of the *Rig Veda* were orally transmitted long before they were put in writing. However, the language used in the *Rig Veda* is said to be not later than the tenth century B.C. other *Vedas*, for instance, the *Atharva Veda* containing prayers, hymns and charms, have comparatively modern language, The *Upanishads* (the philosophical treatises), the *Mahabharata* and *Ramayana* have been composed in comparatively much modern language." (P.129).

তিনি আরও ব'লেছেন—"The Sanskrit records bearing clear dates are not very old, the oldest being from a *Sakae* ruler of India and dated, 150 B.C.

The word *Sanskrit* means `Standard language' as against *Prakrit* which means 'slang'.

As Sanskrit became the literary and standard language, the scholars came out to compile its grammar. The Sanskrit Grammar compiled by Panini in **the fourth century B.C. is the oldest grammar work in the world.** Though Sanskrit has undergone much change on account of its popularity and expansion in

respect of meaning and vocabulary, yet its old form is still preserved." খানলারির এসব কথা যে, এখন ক্রমাগত গুরুত্বহীন হ'য়ে প'ড়েছে—তা না-কবুল করার উপায় নেই।

খানলারী—'বেদ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব'লেছেন। কিন্তু বেদের ভাষা আর পাণিনী-সংস্কৃত এক নয়, বৌদ্ধ সংস্কৃতও ভিন্ন। বর্তমান-সংস্কৃত অতি আধুনিক ভাষা। নব সৃষ্ট এই ভষার কুল-পরিচয়ের গৌরব বাড়াতে ভারতীয়রা এবং আঠারো-উনিশ শতকের ইউরোপীয় বৃটিশ-জার্মান পণ্ডিতরা বেদের ভাষাকে বৈদিক সংস্কৃত ব'লে নির্দেশ ক'রেছেন। খানলারী ক্রোয়বারের মতই বেদের ভাষাকে 'সংস্কৃত' ব'লেছেন। তিনি এর প্রাচীনতম নমুনা খৃষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দ বা খৃ. পৃ. দশ শতক ব'লে আর তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতের প্রাচীনতম নমুনা ১৫০ খৃ. পূ. ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন।

চ) 'বেদ'-আবিষ্কারের নেপথ্যে

কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকে বৃটিশ শাসনামলে ভারতে 'বেদ' আবিষ্কার ও প্রকাশের যে-ইতিহাস সম্প্রতি ভারত থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে—তা বিস্ময়কর। এবিষয়ে গোলাম আহ্‌মাদ মোর্তজা ম্যাক্সমূলারের, বেদ-আবিষ্কার, সংস্কৃত ভাষার জন্ম ও পাণিনী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পহেলা "ম্যাক্সমূলার"-এর পরিচয় ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি যা' লিখেছেন, তাহ'ল—"বিশ্বের বাছাই করা বুদ্ধিজীবীদের দশজনের একজন ছিলেন অধ্যাপক ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলার [১৮২৩-১৯০০] আধুনিকতাবাদীদের মতে, ভারতের সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃতি ও নানা ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টির প্রধান স্রষ্টা এবং মহানায়ক এই মি. ম্যাক্সমূলার। বিশ্ববিখ্যাত ঐ রকম কারিগর পঞ্চাশ বছর ধ'রে কোন বিষয়ের নাম ক'রে যদি কিছু সৃষ্টি করেন, তার সঙ্গে ইংলণ্ড-সরকার যদি সহায়তা করে, সেই সঙ্গে যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলো তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়—তার ফলাফল কী হ'তে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না মোটেই। পণ্ডিতগণ যাই-ই বলুন না কেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,—"জানো কি, অধ্যাপক ম্যাক্সম্যুলার 'নাইন্টিন সেঞ্চুরি' কাগজে একটা লেখা লিখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে। প্রয়োজনীয় উপরকণ পেলে তিনি সানন্দে তাঁর জীবনী ও বাণী সমেত একটা বই লেখবার জন্য তৈরী হ'য়ে আছেন। অধ্যাপক ম্যাক্সম্যুলার এক অসাধারণ মানুষ। ক'দিন আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম। আসলে আমি গেছিলাম তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাতে।... ম্যাক্সম্যুলার যেন সহৃদয়তার প্রতিমূর্তি।... যে-যুগে বাস ক'রতেন ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা এবং মহৎ

বাণপ্রস্থপ্রার্থী মানুষেরা—যে-যুগ অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠাদির যুগ; ম্যাক্সমূলার ঐ যুগের ঋষিদের চিন্তারাজির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন জগতের। ভারতের সেই প্রাচীন যুগের প্রতি মানুষের বিরোধ ও ঘৃণা দূর ক'রেছেন এবং পরম শ্রদ্ধায় দীর্ঘকাল ধ'রে দুঃসাধ্য কাজে নিবেদিত প্রাণ থেকেছেন।...

পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসেবে তিনি বিশ্বে আলোড়ন এনেছেন ঠিক-ই, তবু তাঁর বিদ্যা ও দর্শন তাঁকে ক্রমিক ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে চৈতন্যসত্ত্বার স্পর্শ দিয়েছে। ভারতের ওপর আধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের যে অপার অনুরাগ তার শতাংশের একাংশও যদি আমার থাকতো তাহ'লে আমি ধন্য হ'তাম। এই অনন্য মানবাত্মা পঞ্চাশ বছরের ওপর ভারতীয় চিন্তারাজ্যে কাটিয়েছেন, একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতায় তিনি গ্রহণ ক'রেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্ত অরণ্যভূমির আলো ও ছায়ার বিনিময়... তিনি এক পরম বৈদান্তিক.... তিনি ছিলেন এই প্রাচীন তত্ত্বের সাক্ষাত প্রতিমূর্তি, সনাতন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও আগামীকালের ভারতের অগ্রদূত। তাঁর মধ্য দিয়েই সমস্ত জাতি আধ্যাত্মিক আলো লাভ ক'রবে।... অথচ কোথা থেকে এসে জুড়ে ব'সল এই সংস্কৃত ! বেশির ভাগ পশ্চিমী পণ্ডিত তখন এর নামও শোনেন নি।... তবে ভারতের এবং ভারতীয় চিন্তাভাবানার সবচেয়ে বড় বন্ধু হলেন পল ডয়সেন (কিংবা নিজেকে তিনি যেমন সংস্কৃতে দেবসেনা বলেন) এবং প্রবীণ ম্যাক্সমূলার (ইনিও নিজের নাম সংস্কৃতে রাখেন—'মোক্ষম্যূলর)... আনন্দের কথা হ'ল ই্ওরোপে সম্প্রতি এক দল নতুন ধরণের সংস্কৃত পণ্ডিত দেখা যাচ্ছে.... যাঁরা শ্রদ্ধাবান সমমর্মী এবং প্রকৃত জ্ঞানী। আর আমাদের ম্যাক্সম্যূলার-ই ঐ পুরনো এবং নতুন দলের সংযোজক। আমরা হিন্দুরা সংস্কৃতজ্ঞ অন্যান্য পণ্ডিতের চেয়ে তাঁর কাছেই বেশি ঋণী।....আর একবার এঁর সম্বন্ধে ভেবে দেখ। প্রাচীন হস্তলিপির সেই সব পুঁথি যা হিন্দুদের চোখেও অস্পষ্ট; তিনি তাই ঘেঁটে চ'লেছেন দিনরাত। সেই পুঁথি এমন এক ভাষায় লেখা যে, সেটা আয়ত্ত ক'রতে একজন ভারতীয়রও সারাজীবন লেগে যায়।... এবং বহু কাল ধ'রে এই প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি বৈদিক সাহিত্যের অরণ্যের মধ্য দিয়ে অন্যের এগোবার মত সহজপথ তৈরি ক'রে দিতে পেরেছেন।... ম্যাক্সম্যূলারকে যদি বলি এই সব আন্দোলনের প্রবীণ অগ্রদূত, তবে পল ডয়সেন অবশ্যই তাঁর এক নবীন পতাকাবাহক।" (পৃষ্ঠা ৭২০-'২২)।

তারপর লেখক ব'লেছেন—"আশ্চর্যের কথা এটাই, এই খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলারের জন্মভূমি জার্মানী হ'লেও—তাঁর সারা জীবনের কর্মভূমি ছিল ইংলণ্ড। ভারতবর্ষের মাটিতে একদিনের জন্যও না এসে, বৃটিশের আদেশে ইংলণ্ড থেকেই তাঁর পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতায় ভারতের জন্য সৃষ্টি ক'রে দিলেন সংস্কৃত সভ্যতার নতুন এক বিরাট বেলুন!

যে সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁর প্রদর্শিত পথকে আরো মজবুত ক'রতে জ্ঞান, বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য যোগ ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—থাডান্‌স্ আনসেল্‌ম রিজনার, ফ্রেডারিক হুগো, জে. ডি. লাঞ্জুইনে, আল্ ব্রেক্‌ত ওয়েবার, মিসেস চার্লস স্পীয়ার, ম্যাক্স কার্ল ভন ক্রেপেল হিউবার, মিসেস চার্লট ম্যানিং, পল রেগনল্ড, আর্চিবাল্ড গাফ, হার্মান ওল্ডেনবার্গ, লিওপল্ড ভন শ্রোডার, চার্লস রকওয়েল লানমান [হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক], লিপ্‌জিগের রিচার্ড গার্ব, হার্বার্ট বেনেস [ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়], ই. ডবলিউ. হপকিন্স, অ্যানি বেসান্ত, আলফ্রেড গোডেন, হার্ভে গ্রীস ওলড, আর্থার ম্যাকডোনেল, হার্ভার্ডের জেসিয়া রয়েস, আর্থার ইউইং, মরিস ব্লুমফিল্ড, পল্ এলমার মোর, আর. গর্ডন উইলবার্ণ, জে. এস. স্পেয়ার, আর. ডবলিউ. ফ্রেজার, নিকল ম্যাকনিকল, জেমস প্রাট, ফ্রাঙ্কলিন এডগার্টন, হেনরিক লুডার্স, ডরোথি জেন স্টিফেন, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, জর্জ উইলিয়াম ব্রাউন, বেটি হাইম্যান, ফ্রেডারিক হেলার প্রমুখ। আধুনিক গবেষকদের মতে, বেদ বৃটিশের চক্রান্তের সৃষ্টি। এ-কথা সত্য হ'তে হ'লে এবং বৃটিশ সরকার এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থব্যয় ক'রেছে এটা প্রমাণ ক'রতে হ'লে বিপক্ষীয় পণ্ডিতদের তুলনায় পক্ষীয় পণ্ডিতদের মন্তব্যই বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ড শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে'র ১৩৯ পৃষ্ঠায় আছে—"ম্যাক্সমূলারের সম্পাদিত ঋগ্বেদ তখন ব্যবহারের জন্য আনা হ'য়েছিল। স্বামীজী প্রসঙ্গতঃ বলেন, 'মনে হ'ল কি জানিস—সায়ন-ই নিজের ভাষা নিজে উদ্ধার ক'রতে ম্যাক্সমূলার রূপে পুনরায় জ'ন্মেছেন। আমার অনেকদিন হ'তেই ঐ ধারণা।...জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ **যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়-ই আছে সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচ-ই বা কোথায় পেতেন?** শুনিস্‌নি,—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল? তাতেও কুলোয়নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এই কাজে নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এই রূপ বিপুল অর্থব্যয়, এই রূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ-দেশের এ-যুগের কেউ কি কখনো দেখেছে? ম্যাক্সম্যূলার নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসরকাল কেবল ম্যানাসক্রিপ্ট লিখেছেন। তারপর ছাপাতে ২০ বৎসর লেগেছে। ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এই রূপ লেগে-প'ড়ে থাকা সামান্য মানুষের কাজ নয়। এতেই বোঝ্, সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!"

অতঃপর লেখকের উক্তি—"ফা হিয়েন"-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কমিউনিস্ট

চীনেও গবেষণা হয়। "কৌটিলীয় অর্থাশাস্ত্র" সম্পর্কে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পণ্ডিতও মাথা ঘামান। অস্তিত্বহীন 'ফা হিয়েন' বেঁচে থাকেন সগৌরবে—'কৌটিল্য' নামক কল্পিত চরিত্রও জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। সোনার প্রাচীন প্রচলনের গল্প সোভিয়েত রাশিয়ার আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের তরফ থেকেও বানিয়ে নেওয়া হয়। গ্রীসের ইতিহাস গ্রীসের পণ্ডিত লেখেন নি। ইজিপ্টের ইতিহাস ঈজিপ্টের পণ্ডিত লেখেননি। অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, ভারত, চীন কোনও দেশের-ই ইতিহাস সে-দেশের পণ্ডিত লেখেন নি। লিখেছিলেন—দুনিয়ার ইতিহাসের স্রষ্টা ঐ ইউরোপ। জার্মানীর পণ্ডিত গ্রীসে ঘুরে আসতেন। ফ্রান্সের পণ্ডিত ইজিপ্ট। ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিত ভারতবর্ষে। 'সুসভ্য' সব দেশেই এঁদের সকলের যাতায়াত ছিল—স্বচ্ছন্দ, অবারিত। গ্রীসের 'ইতিহাস' লেখার পণ্ডিত করিত-কর্মার পরিচয় দিয়ে 'ডিউটি' পেতেন—ভারতে। একটা আন্তর্জাতিক চক্র গ'ড়ে উঠেছিল। স্থানীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতা ছাড়া ঐ কাঁচামালের পাহাড় যে তৈরী হ'তেই পারতনা—এটা বলাই বাহুল্য। পরিপূর্ণ গোপনতার মধ্যেই কাজকর্ম চ'লত। কাকপক্ষী টের পেত না। এমন-ই ছিল সে গোপনতা। উভয় দলের পণ্ডিতদের কেউ কেউ পরম কারুণিক বৃটিশ সরকারের 'স্যার' খেতাব কুড়িয়েছেন। কেউ রায়বাহাদুর—কেউ বা মহামহোপাধ্যায়। ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখার আগেই কিছু 'তত্ত্ব' (অর্থাৎ মিথ্যা) তৈরী ক'রে নিয়েছিলেন। পরে ঐ 'তত্ত্বে'র সঙ্গে মিলিয়ে কিছু 'তথ্য' বানিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ 'তথ্যে'র নাম প্রাচীন ইতিহাস।...

বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা কয়েকটি বিভ্রান্তিকর মিথ্যাকে ভারত- ইতিহাসের মূল সত্য হিসাবে তুলে ধ'রলেন। এক, **হিন্দুধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন এবং সুসংহত একটি ধর্ম**। দুই, ঐ ধর্মের ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষাটাও সমপরিমাণে সুপ্রাচীন। তিন, হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষা শুধু প্রাচীন-ই নয়—গৌরবোজ্জ্বল অতীতেরও অধিকারী। চার, সর্বভারতীয় মানসিকতার ঐক্যবোধ বেশ মজবুত এবং প্রাচীনও বটে। পাঁচ, হিন্দুধর্মের এবং 'সংস্কৃত ভাষার স্বর্ণ-যুগ অতীতে শেষ হয়ে গিয়েছে—পরে দুটির-ই অবক্ষয় শুরু। ছয়, ভারত-সংস্কৃতির মূল উপাদান ধর্ম। এই ক'টি মিথ্যার সঙ্গে আর এক মোক্ষম মিথ্যা 'আর্যতত্ত্ব' জুড়ে দিয়ে বৃটিশ সরকারের ভাড়াটে ঐতিহাসিকেরা ভারতের ইতিহাস 'তৈরী করার' কর্মকাণ্ড শুরু ক'রলেন। আর্যতত্ত্বটাকে ভারতের ঐতিহাসিকেরা লুফে নিলেন। হিন্দু ঐতিহ্যবাদীদের মহা আনন্দের দিন এসে গেল—রাতারাতি তাঁরা আর্যহিন্দু হ'য়ে গেলেন। ধর্মের সোনায় আর্যের সোহাগা মিশল। আর্য 'জাতি', সংস্কৃত 'ভাষা' এবং হিন্দু 'ধর্ম'—এই ত্রিতত্ত্বের ত্রিবেণী-সংগমে স্নান ক'রে ভারতের ঐতিহাসিকেরা

তিনের মহিমাকীর্তনে উঠে পড়ে লাগলেন।"

"শ্বেত দ্বৈপায়ন 'বস' (Boss) ভারতে এসে হলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। 'বস' মানে arrenger, ব্যাস মানেও তাই। .. ধুরন্ধর মিঃ 'বস' সব ব্যবস্থাই ক'রে দিলেন।.. রাজ্যের ধর্মপুস্তক লেখানোর ব্যবস্থা হ'ল। উদ্ভট উদ্ভট নামের মুনী-ঋষিদের লেখা ব'লে ওগুলোকে চালানো হ'ল। ষড়দর্শন [ষড়যন্ত্রের আর এক নাম] বানিয়ে নেওয়া হ'ল। বিদিকিচ্ছিরি সব নামের 'দার্শনিক'দের লেখা ব'লে ওগুলোকে প্রচার করা হ'ল। মহাভারত আর আঠারো দুগুণে ছত্রিশখানা পুরাণ [এছাড়া আরও কয়েকটি বইও ছিল] লেখানোর ব্যবস্থা ক'রে নিজের নামেই চালিয়ে দিলেন ব্যাসীভূত 'বস'। ধর্মপুস্তক, মহাকাব্য, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণের বন্যা ব'য়ে গেল। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া ব'লে প্রচারিত বইগুলোর ওপর পবিত্রতা ও প্রাচীনত্বের বহর চাপানো হ'ল।.... **দেড়হাজার বছরের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখানোর কাজে হাজার দেড়েক ইউরোপীয় 'ঐতিহাসিক'কে আসরে নামানো হ'ল**। জার্মান, ফরাসী, হাঙ্গেরীয়, ইটালীয়, পোলিশ, রুশীয়—ইউরোপের প্রায় সব জাতের পণ্ডিতদের ডাকা হ'ল ঐ কর্মযজ্ঞে।... রামায়ণ লেখানো হ'ল।

পাণিনী তাঁর ব্যাকরণটা কোন্ লিপিতে লিখেছিলেন? ওটা কি খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা হ'য়েছিল? ইতিহাসে সেরকম কোনও তথ্য পাচ্ছিনা।...**লিপি প্রবর্তনের আগে কি লিপিহীন ভাষায় ব্যাকরণ লেখা সম্ভব?...** পাণিনী তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী'তে ব্রাহ্মীলিপিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি নাকি প্রাচীন কালের 'বৈয়াকরণ'। ইতিহাস ব'লছে তিনি নাকি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের। **আঠারো শতকে তৈরী ক'রে নেওয়া তথাকথিত ব্রাহ্মীলিপির সন্ধান খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ঐ পাণিনী মহাশয় পেলেন কি ক'রে?** তবে কি ব্রাহ্মীলিপি 'উদ্ভাবিত' হওয়ার পরে ঐ 'বৈয়াকরণ' চুড়ামণির জন্ম?"

বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে মোর্তজা সাহেব আরও জানিয়েছেন—(বি.আর্যের রচনা কোট্ ক'রে)—"বেদনামের কোন ধর্মগ্রন্থ যে ভারতে ছিল এ-তথ্য কেউ-ই জানতেন না। আর ঐ ধর্মগ্রন্থে কি ছিল আর কি ছিল না—এটা জানার প্রশ্নও ছিল অবান্তর। **বেদের পুঁথি কেউ-ই দেখেন নি**। বৃটিশেরা আসার বেশ কিছু পরে বেদ নামটার প্রচার শুরু হয়।... **১৭৮৬ সালের আগে ঐ 'আর্যভাষা' বা 'আর্যজাতি'র ধারণার জন্মই হয় নি**।.....অস্তিত্বহীন পুঁথির ওপরও যে গবেষণা করা যায় এবং সে-গবেষণার সঙ্গে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের ডাকসাইটে সব পণ্ডিতও যে জড়িত থাকতে পারেন, এটা ভাবতেও অবাক লাগে।... বুঝতে কষ্ট হয় না —একটা

আন্তর্জাতিক সুসংহত এবং সুসংগঠিত চক্রান্ত ঐ কর্মকাণ্ডের পিছনে কাজ ক'রেছিল।... বেদ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন এবং 'প্রামাণ্য' যে লেখাটা পাচ্ছি, সেটা ছাপা হ'য়েছিল ১৮০৫ সালে। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে। একটি প্রবন্ধ আকারে সেটা ছাপা হ'য়েছিল। লেখক ছিলেন কোলব্রুক। প্রবন্ধের নাম ছিল 'On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus'। 'or' শব্দটা তাৎপর্যপূর্ণ। বেদ 'অর্থাৎ হিন্দুদের পবিত্র রচনা'। বোঝা যাচ্ছে 'বেদ' নামক শব্দের অর্থটাও তখনও পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নি। হ'য়ে থাকলে ঐ 'or' শব্দটা ওখানে ব'সতোনা।.. কোলব্রুকের ঐ নমুনা প্রকাশের দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পরে ১৮৩৮ সালে 'ঋক' বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। সংস্কৃতে নয়, ল্যাটিনে। তাও ভারতে নয় সুদূর লণ্ডনে। সেই খণ্ডটিতে ছিল ঋগ্বেদের ঐ অংশের ল্যাটিন অনুবাদ এবং সেই অনুবাদের ওপরে লেখা অসম্পূর্ণ কিছু ল্যাটিন টীকা। বইটা সম্পাদনা ক'রেছিলেন ফরাসি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রোঝ্যাঁ। ফরাসী পণ্ডিতের সম্পাদিত বই—ছাপা হ'ল ইংল্যাণ্ডে [উৎস—নীরদ. সি. চৌধুরীর The scholar Extraordinary.] রোঝ্যাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদের ঐ বই আর বিবলিওথিক নাশিওনালে রক্ষিত ব'লে প্রচারিত বেদের পাণ্ডুলিপির (বলাবাহুল্য, অস্তিত্বহীন) ওপর নির্ভর ক'রে, ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ্ বুর্নু 'বেদ' সম্পর্কে কিছু গবেষণা ক'রে নিলেন। বক্তৃতাও ক'রে বেড়ালেন। তবে ঐ পর্যন্তই। বিরাট আকৃতির কোন লেখা তিনি প্রকাশ করেন নি। ঋগ্বেদের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেন "The Sacred Literature of the Hindus" ডাবলিন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। থিওডোর বেন্‌ফে 'সাম' বেদের জার্মান অনুবাদ করেন ১৮৪৮ সালে। ভেবার যজুর্বেদের জার্মান অনুবাদ করেন ১৮৫২ সালে। সে যাইহোক ঐ সময়েই বেদের সবচেয়ে বড় বোদ্ধা ম্যাক্সমূলারের প্রয়াস যুক্ত হ'ল বেদ-ঘটিত কর্মকাণ্ডে। ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হোল ১৮৪৯ সালে।.... ছ' খণ্ডে সমাপ্ত ঐ ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হোল ১৮৭৫ সালে। জার্মান ঋগ্বেদ আলফ্রেড্ লুড্‌ভিগ-এর সম্পাদনায় পূর্ণতঃ প্রকাশিত হোল ১৮৭৬ সালে। ফরাসী ভাষায় অনূদিত লাঁলোয়া-সম্পাদিত ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। সিদ্ধান্ত নিতেই হয় ১৮৭০ সালের আগে কোন ভাষাতেই ঋগ্বেদ পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয় নি।... **বেদের বৈদিক বয়ান কেউ দেখলেন না; আর তার আগে সত্য ইংরেজি, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান অনুবাদের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল**। নিঃসন্দেহে মজার ব্যাপার।... প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ ঐ কর্মকাণ্ডে অর্থের যোগান দিয়েছিলেন কে? দিয়েছিলেন ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কোম্পানীর বকলমে বৃটিশ সরকার-ই কি ঐ সব খরচ বহন ক'রেছিলেন? একদিকে ভারত নামক ভূ-খণ্ডের ভবিষ্যৎ ঝরঝ'রে করার ব্যবস্থা; আর অন্যদিকে তার

অতীতকে উজ্জ্বল বানাবার খেলাই কি শুরু ক'রেছিলেন মহানুভব বৃটিশ সরকার?

বেদের পুঁথি হয়না। বেদের প্রাচীন পুঁথি থাকতেই পারে না।..... বেদ যাতে কোনওক্রমে লিপিবদ্ধ না হয়—তার জন্য বিধান ছিল—যাঁরা বেদ লিপিবদ্ধ ক'রবেন তাঁরা নরকগামী হবেন। বেদবিক্রয়িনশ্চৈব বেদানাং চৈব লেখকাঃ/ বেদানাং দূষকাশ্চৈব তৈবৈ নিরয়গামিনঃ।"...ইত্যাদি।

অধ্যাপক খানলারি, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামূল হক, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ প্রভৃতি, বেশুমার আলেমের নিকট সর্বাধিক অথেন্‌টিক, অপৌরুষেয় 'বেদ'-আবিষ্কার, তরজমা, মুদ্রণ আর 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা'র শত শত শিলালিপি, তাম্রলিপির এই হ'ল জন্মকথা। 'রামের জন্মের আগে রামায়ণের জন্ম' ভু-ভারতে কেবল একবার-ই হয়নি। এক ক্ষেত্রে হয়নি। বহুবার, বহুক্ষেত্রে, বহু রকমে হ'য়েছে।

ছ) উপনিষদ্-রচনার নেপথ্যে

এবার উপনিষদাদির কথায় আসা যাক। এ-বিষয়ে জনাব মোর্তজা লিখেছেন—"প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে নাকি ঐ বেদ 'রচিত' হ'য়েছিল। আর তার শ' পাঁচেক বছর পরে নাকি ঐ উপনিষদ । সূত্র-স্মৃতি-পুরাণ নাকি রচিত হ'য়েছিল এর পরে কয়েকশো বছর ধ'রে। 'রচিত' শব্দটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। যে যুগে ঐ বেদ-উপনিষদ 'রচিত' হ'য়েছিল ব'লে প্রচার করা হয়—সে-যুগে লেখার রেওয়াজ-ই ছিল না।... এবং লিপির জন্ম হয়নি ব'লেই তখন সব কিছু 'রচিত' হ'ত—লিখিত হ'ত না। সব কিছুই মুখে মুখে চ'লত। এই আজগুবি তথ্যের একটা সুন্দর নাম দেওয়া হ'য়েছে—'শ্রুতিপরম্পরা'। শ্রুতিপরম্পরাতেই নাকি বেদ-উপনিষদ, বেঁচে থাকত।... **ভারতের প্রায় তাবৎ পণ্ডিত এই জলজ্যান্ত মিথ্যাটা বিশ্বাস ক'রে নিয়েছেন**।.. ভারতের পণ্ডিতেরা শুধু তথ্যটি বিশ্বাস ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, ঐ দুই গ্রন্থাবলীর ওপর ভিত্তি করে নানা তত্ত্বও তৈরী ক'রে নিয়েছেন। রাজ্যের থিসিস তৈরী হ'য়েছে। ডক্টরেট পেতেও অসুবিধা হয়নি। দরাজ হাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের পাণ্ডিত্যের। **মূলেই যে ফাঁকি, এইটাই তাঁরা ধ'রতে পারেননি**।"

উপনিষদের জন্মকথা ব'লতে গিয়ে বি. আর্য লিখেছেন,—"এক ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ্ আঁকেতি দুপেরঁ ভারতে এসেছিলেন ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে। আট বছর তিনি এদেশে ছিলেন। ঐ বছরে সংস্কৃত এবং 'আবেস্তার ভাষা' দু-দুটো ভাষা শিখে নিয়ে

তিনি ইউরোপে ফিরে গিয়েছিলেন ১৭৬২ তে। ফেরার সময় বেশকিছু ফারসী পুঁথি তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপনিষদের ফারসী অনুবাদের সেই সব পুঁথি থেকে ল্যাটিন অনুবাদ করার কাজ তিনি শুরু ক'রলেন ওখানে গিয়েই। উপনিষদের দু'রকম ফারসী অনুবাদ থেকে তুলনামূলক সূক্ষ্মবিচার সেরে........১৮০১ [১৮০২?] সালে উপনিষদগুলোর ল্যাটিন অনুবাদের কাজটা শেষ হ'ল। অনুবাদটির ল্যাটিন নাম তিনি রাখলেন Oupnik'hat নিঃসন্দেহে বিচিত্র বানান। দুই, কঠোপনিষদের ফারসী অনুবাদ থেকে রামমোহন রায় ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ ক'রেছিলেন। বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। আর ইংরেজী অনুবাদটা ১৮১৯ সালে। এছাড়া বাংলায় আরও পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ তিনি ক'রেছিলেন [কেন, ইশ, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক]। হিন্দিতে চারটি উপনিষদের অনুবাদও তিনি-ই ক'রেছিলেন।"

এ-বিষয়ে লেখকের প্রশ্ন—"এক, **সংস্কৃত উপনিষদ যদি থেকেই থাকবে তবে তার অনুবাদের অনুবাদ করার দরকার প'ড়ল কেন?** সোজাসুজি সংস্কৃত বই থেকে অনুবাদ করার কি কিছু অসুবিধা ছিল [যেহেতু রামমোহন ভাল সংস্কৃত জানতেনঃ এই বইয়ের লেখক] ? দুই, তবে কি সংস্কৃত নামক বইয়ের অস্তিত্বই ছিল না? তবে কি অস্তিত্বহীন সেই সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর ফারসী সংস্করণটা আসলে একটা তৈরী করা [manufactured] বই ? তিন, সাহেব পণ্ডিতদের নির্দেশে লেখা একটা মতলবের নামই কি ঐ ফারসী উপনিষদ? কোনও ভাড়াটে ফারসী পণ্ডিতকে দিয়ে কি ঐ ফারসী উপনিষদগুলো লেখানো হ'য়েছিল?.........দুপেরঁ সাহেব **শিখেছিলেন "আবেস্তার ভাষা" আর তর্জমা ক'রে ব'সলেন ফারসী ভাষা থেকে। এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল?** অধুনিক ফারসী ভাষা তিনি শিখলেন কবে? আর যদি মনে ক'রে নেওয়া যায়—উপনিষদগুলো 'আবেস্তার ভাষা'-য় লেখা হ'য়েছিল, তাহ'লেও ত আর এক প্রশ্ন আসছে। রামমোহন রায়-ই বা সেগুলির তর্জমা ক'রলেন কি ক'রে? তিনি ত আধুনিক ফার্সী ভাষাটাই জানতেন—'আবেস্তার ভাষা' নয়।

প্রশ্ন আরও আসছে। যে-সংস্কৃত উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূল্যবান মনে ক'রে ব'সলেন—যে-উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ করার কাজে দীর্ঘ ৪০ বৎসর তাঁরা কাটিয়ে দিলেন—সেই সংস্কৃত উপনিষদ ঐ **৪০ বছরের মধ্যে ভারতে প্রকাশ করা হ'ল না** কেন? সংস্কৃত বইয়ের সন্ধান নেই—তার ল্যাটিন তর্জমা করার-ই বা এত দরকার প'ড়ল কেন? ল্যাটিন ভাষাটা কি দুনিয়ার 'ধার্মিকজালিয়াতি' পুষে রাখার মাধ্যম? তবে কি ঐ তর্জমা করার ব্যাপারটাই একটা

ভাঁওতা? তবে কি ঐ চল্লিশ বছর ধ'রে সংস্কৃত উপনিষদ্‌গুলো ভারতে কোথাও লেখানো হ'চ্ছিল?

শাহ্‌জাহানের পুত্র দারাশিকোহ্ কাশ্মীরে গিয়েছিলেন ১৬৪০ সালে। ওখানে থাকার সময় সংস্কৃত ভাষায় লেখা উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী নাকি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল। বইটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হ'য়ে কি না জানিনা, তিনি নতুন উদ্যমে বইটির আর এক প্রস্থ তর্জমা করার ব্যবস্থা ক'রে ব'সলেন। মতান্তরে মহাপণ্ডিত দারাশিকোহ্ নিজেই নাকি এ-অনুবাদটা ক'রেছিলেন। তবে এইটুকু বলতে পারি উপনিষদের তর্জমা করার অপরাধের গল্পটা আরোপ করার ব্যবস্থা হ'য়েছিল পরিকল্পিত ভাবেই। ব্যবস্থা হ'য়েছিল কারণ **মধ্যযুগেও অনেকে 'উপনিষদ'-এর চর্চা ক'রতেন—এই বানানো গল্পটাকে প্রমাণসিদ্ধ করার তাগিদ ঐতিহাসিকেরা বোধ ক'রেছিলেন**।..... ঐ ফারসী তর্জমা করার সময় কি ঐ উপনিষদ গ্রন্থাবলীটা হারিয়ে গিয়েছিল? আর হারিয়েই যদি না যাবে, তবে ফারসী ভাষা থেকে অনুবাদ করার দরকার-ই বা প'ড়ল কেন? সংস্কৃত গ্রন্থাবলীটা গেল কোথায়?" (অ-ব্রাহ্মণেরা বেদ শিখলে যদি তাদের জিভ কেটে ও কানে তপ্ত সীসা ঢেলে দেবার ব্যবস্থা থেকে থাকে, তাহ'লে যবন, **অহিন্দু শাহ্‌জাহানের পুত্র দারা শিকোহ্ সংস্কৃত শিখলেন কি ক'রে?**—লেখক]

ইন্‌টেলেকচুয়াল ষড়যন্ত্র করার মানসিকতা যে ১৭৬৩ সালে ইংরাজদের এসে গিয়েছিল তার প্রমাণ স্ক্র্যাফ্‌টন সাহেবের লেখা A History of Bengal Before and After the Plassey [1739-1758] বইয়ে বর্ণিত **'বিদম্' নামক কল্পিত বইয়ের তত্ত্ব-প্রচারের** সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে।"

জ) 'ব্রহ্ম সিদ্ধান্তাদি' গ্রন্থ ও ষড়দর্শন-এর নেপথ্যে

"ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-কর্তাদের লেখা গ্রন্থগুলো বা বাদরি, বশিষ্ঠাদি আচার্যদের 'রচিত' 'প্রচুরগ্রন্থ' 'প্রকাশিত' হওয়ার খবর রামমোহন রায় পেলেন কোত্থেকে? **ওসব বই যে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিতই হয়নি**। ওসব-ই প্রকাশিত হ'য়েছিল উনিশ শতকের শেষার্ধে। তাহ'লে? এসব বইয়ের নামগুলোই শুধু **তখন পর্যন্ত প্রচার করা হ'য়েছিল। কায়দাটা একটু খুলে বলা যাক। মিথ্যার কারবারীরা যে-সব বই লেখানোর পরিকল্পনা নিতেন, সে-সব বইয়ের নামগুলো পূর্বাহ্নে প্রচার করার দায়িত্বও নিয়ে নিতেন। 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' লেখানোর পরিকল্পনা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইটির নামের প্রচার শুরু হ'য়ে গিয়েছিল। বইয়ের সন্ধান নেই—বইয়ের নামের প্রচারটা শুরু হ'য়ে যেত। ধুরন্ধর কোলব্রুক সাহেব এ রকম**

অনেক বইয়ের নাম [লেখকের নাম সহ] পূর্বাহ্নেই প্রকাশ ক'রেছিলেন যে-সব বই তখনও লেখাই হয়নি। দু-একজন লেখকের নাম দেওয়া যাক। 'আর্যভট্ট', 'ব্রহ্মগুপ্ত', 'বরাহমিহির'। মজার কথা আরও আছে। প্রাচীন সমস্ত সংস্কৃত বই-ই 'আবিষ্কার' ক'রেছিলেন বিশেষ জাতের পণ্ডিতেরা। আজ মিঃ জন একটি বই 'আবিষ্কার' ক'রলেন তো কাল ক'রলেন মিঃ বুল। পরের দিন কোন বিশ্বাস-ভাজন আমলা বা মহামহোপাধ্যায় কিংবা কোনও রায়বাহাদুর।

(যাহোক) দু'চারজন ঐ ব্রহ্মের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ক'রলেও বেশির ভাগ লোক-ই কিন্তু মেনে নিলেন ঐ মিথ্যাটা। তাঁরা মনে ক'রলেন কীটদষ্ট উপনিষদ্‌গুলো বুঝিবা শতাব্দীর পর শতাব্দী কোনও অজ্ঞাত জায়গায় চাপাচোপা দেওয়া ছিল। কয়েকজন উৎসাহী ধর্মবীরের কল্যাণে বুঝিবা ওগুলোর উদ্ধার সম্ভব হ'য়েছে। **যে-বই কস্মিনকালেও ভারতে ছিল না**—যে-বইয়ের মূল্যবান (?) তত্ত্ব কস্মিনকালেও ভারতে আলোচিত হ'ত না—**সেই বই প্রচারের ঠেলায় হ'য়ে দাঁড়াল হিন্দুদের মহান ধর্মগ্রন্থ।**

তথাকথিত ব্রহ্মের স্বরূপ রামমোহনের না জানার কথা নয়। তিনি সব-ই বুঝেছিলেন। **সংস্কৃত বইয়ের পাত্তা নেই—তস্য ফারসী অনুবাদের বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি অনুবাদ** ক'রতে গিয়ে তিনি পুরো ব্যাপারটাই অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন। জালিয়াতি উদ্যোগের শরীক তিনি হ'য়েছিলেন স্বজ্ঞানেই। ইন্দো-বৃটিশ ইন্‌টেলেকচুয়াল ষড়যন্ত্রের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ইংলণ্ডের ওরিয়েন্টালিস্ট চক্রের ক্রীড়নক রামমোহন নিজে উপনিষদের অনুবাদ ক'রেও ব'লতে পেরেছিলেন সে-তত্ত্ব সাধারণ মানুষের জন্য নয়।... ওসব তত্ত্ব শিক্ষিত মানুষের জন্য... রামমোহনের যুগেই আবার, ইংলণ্ডের অ্যাংলিসিস্ট গোষ্ঠী সাময়িকভাবে তৎপর হ'য়েছিলেন। ওরিয়েন্টালিস্ট চক্রের নেপথ্য কর্মকাণ্ড চ'লতে থাকলেও বাহ্যতঃ ঐ অ্যাংলিসিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল।

বৃটিশ সরকারের বানানো বৈদান্তিক ধর্মপ্রচারের দায়দায়িত্ব বেশ কয়েকজন 'মহাপুরুষ' বুঝে নিয়েছিলেন। আঠারো শতকের রামমোহন [কর্মকাণ্ড উনিশ শতকের প্রথমার্ধে], উনিশ শতকের নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর তথাকথিত আট বা ন' শতকের **কল্পিত শংকর**.....। **রাজ্যের উপনিষদের প্রকাশ ঘ'টতে শুরু হ'য়েছিল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকেই।** প্রচারের উদ্যমও তখন থেকেই নেওয়া হ'য়েছিল। তা সত্ত্বেও কাজ খুব একটা এগোয়নি। ব্রাহ্মধর্মের নেতাদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও ঐ উপনিষদেকে 'পপুলার' করা সম্ভব হয় নি। **সেটা সম্ভব হ'য়েছিল পরে।** 'আবির্ভূত'

হ'লেন উপনিষদের নব্য প্রচারক নরেন্দ্রনাথ দত্ত। .... সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বব্যাধিক সর্বরোগহর [Panacia] নাকি ঐ বেদান্ত। প্রচারের কৌশলটা কিছুটা পাল্টানো হ'ল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহনীয় জেহাদ থাকলো না। দেবদেবীদের স্বমহিমায় থাকার ব্যবস্থা হ'ল পাকা।... উপনিষদে ফুল-বেল পাতা গোঁজা হ'ল একটু বেশী মাত্রায়। **মলাট পালটে নাম দেওয়া হলো—'বেদান্ত'। এক-ই বই—মলাট বদল ক'রে দু-দুটো 'যুগে'র পত্তন ক'রল।"**

এমনিভাবে, পৌরাণিক যুগের পরবর্তী আধা-ধর্মীয় মহাকাব্য সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পাণিনীর ব্যাকরণ ওগয়রহ সৃষ্টি সম্পর্কেও ঐ লেখক অথরিটি কোট্ ক'রে আরও জানিয়েছেন—"সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত যে প্রাচীনকাল থেকে সারা ভারতে [এমন কি বহির্ভারতেও কিছু জায়গায়] ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল—এই কথাই পণ্ডিতেরা জানিয়ে আসছেন। তাই যদি হবে,তবে বই দু'টির পুঁথিমাত্র দু-তিনটি পাওয়া গেল কেন? পণ্ডিতদের ধারণাটা সত্যি হ'লে যে, অনেক বেশী পুঁথি পাওয়ার কথা। যে দু-তিনটি পাওয়া গেছে ব'লে প্রচার করা হ'য়েছে; তাও দেখছি সব-ই ইউরোপে পাচার করা হ'য়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা কি? **রামায়ণ-মহাভারতের পূর্ণ কলেবর পুঁথি কি সত্যিই কেউ দেখেছেন, নাকি সে এক মায়া?**... রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও দু-একটা পুঁথি মেলেনি কেন?" [ঐ পৃষ্ঠা ৫৬] **"কানাড়ীভাষী সংস্কৃত পণ্ডিত সামাশাস্ত্রী** কোলেশন-ব্যাপদেশে মহীশূরের রাজার অতিথি হ'য়ে তথাকথিত 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' সম্পাদনা ক'রে মহামহোপাধ্যায় হ'য়ে ব'সেছিলেন।....

তথাকথিত 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' বইয়ের নামেই গোলমাল। 'অর্থশাস্ত্রে'র; 'অর্থ' অংশের মানে টাকা-পয়সাও নয়—'মানে' [meaning] ও নয়। এমনকি, অভিধানেও শব্দটির যেসব অর্থ দেওয়া হ'য়েছে তার কোনওটাই নয়। ঐ 'অর্থ' শব্দের মানে 'পৃথিবী'। বুঝতে কষ্ট হয় না খাঁটি ও আধুনিক ইংরাজী 'earth'-এর উচ্চারণ চুরি ক'রেই ঐ 'অর্থ' শব্দটি বানানো হ'য়েছিল। বানানো হ'য়েছিল আধুনিক কালেই। 'অর্থশাস্ত্র' মানে economics নয়—ওর মানে 'পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান'।"

"মূল গ্রন্থ প্রকাশের আগেই তার অনুবাদের ব্যবস্থা প্রাচীন অন্য অনেক বইয়ের মতই বৈয়াকরণ-চূড়ামণি পাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী'র ক্ষেত্রেও ঘ'টেছিল। 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে। প্রকাশিত হয়

ইংরেজীতে—সংস্কৃতে নয়।...বলা হ'ল ওটা সংস্কৃত 'অষ্টাধ্যায়ী'র ইংরাজী অনুবাদ। মূল—সংস্কৃত বইটা প্রকাশ না ক'রে তার ইংরেজী অনুবাদটা আগেই কেন প্রকাশ করা হ'ল—এ-প্রশ্ন কেউ তোলেন নি।...সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে।" [ঐ, পৃষ্ঠা-৯২] "আসলে ঐ পাণিনীকে মহাকালের ভারতীয় যীশুখ্রীষ্ট বানাতে গিয়েই ঐ সংস্কৃত ব্যাকরণে 'ভূগোল' রাখার ব্যবস্থা হ'য়েছিল।" [পৃষ্ঠা-৯৩]।

ঝ) অপরাপর লিপি-ভাষা ও সাহিত্য-নির্মাণ

"সংস্কৃত জানা পণ্ডিতদের ওপরে যে কত রকমের দায়িত্ব চাপানো ছিল—তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। তাদের দিয়ে লেখানো হ'ত ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর ননান 'গ্রন্থ'। কাউকে দিয়ে 'মূল' গ্রন্থ, কাউকে দিয়ে তার টীকা-টিপ্পনী। কেউ সাজতেন ব্যাস বা বাল্মীকি কেউ সাজতেন সায়নাচার্য বা মহীধর। **কাউকে দিয়ে লেখানো হ'ত শিলালিপি বা তাম্রশাসনের বয়ান**। যেগুলোকে পরবর্তীকালে ইতিহাসের কাঁচামাল ব'লে চালানো হ'ত। কাউকে দিয়ে লেখানো হ'ত পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্ট-মার্কা নামের ভাষায় কেতাব। লেখানোর পূর্বকৃত্য হিসাবে বানিয়ে রাখা সংস্কৃত 'আদিরূপ'; যাকে রসিকতা ক'রে বলা হ'ত 'ছায়া'। আর তার ছায়া-অবলম্বনে বানানো কাণ্ড-কারখানাটাকে বলা হ'ত 'মূল'।" [পৃষ্ঠা-৯৯]।

কেবল সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য নয়, অপরাপর ভারতীয় ভাষায় তথ্য গুঁজে দেবারও এক-ই পথ বেছে নেয়া হয়। সে-বিষয়ে বি. আর্যের উক্তি—"সংস্কৃত সাহিত্য বানাতে যেমন প্রধানতঃ বাঙালী পণ্ডিতদের কাজে লাগানো হ'য়েছিল; তেমনি পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষার সাহিত্য বানাতে গিয়েও ঐ বাঙালীদের-ই দ্বারস্থ হ'তে হ'য়েছিল ইতিহাসের কাঁচামাল বানানোর নেপথ্য প্রযোজকদের।" [পৃষ্ঠা-১০১]।

এছাড়া পালি-প্রাকৃত, অবহট্ট, অপভ্রংশ ইত্যাদি ভাষায় লেখা সাহিত্য সম্পর্কে ঐ লেখকের বক্তব্য—"সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ অবহট্ট ইত্যাদি ভাষায় প্রকাশিত পুঁথিগুলোর **কোনটার-ই বয়স দুশ' বছরের বেশী নয়**। পণ্ডিতেরা ঐ সব ভাষায় লেখা বেশ কিছু জাল পুঁথি থাকার কথাও স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। পুঁথির কাগজ যে মেট্রিক পদ্ধতিতে কাটা হ'য়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু হাজার হাজার বছরকার পুরনো কাগজ টিঁকল কি ক'রে? তখন কাগজ তৈরী হ'য়েছিল কি? কোন রকমে যদি ঐ মিথ্যাটা মেনেই নেওয়া হয়—তাহ'লে দৈর্ঘ্য প্রস্থ সেন্টিমিটার অর্থাৎ মেট্রিক পদ্ধতিতে হয় কি ক'রে?... দৈর্ঘ্য মাপার কাজে

মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই । অতএব পুঁথিটা পাঁচশ' বছরের পুরনো নয়—**ওটা যে উনিশ শতকের জালিয়াতি তাতে সন্দেহ নেই**। আরও **মজার কথা হ'চ্ছে এই, পুঁথির কাগজ আলোর সামনে ধরতেই Made in France জলছবিটা দেখা গেল**।... পুঁথির কাগজের রঙ্ হলদে। কারণ পোকামাকড় বা ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু আর্সেনিক ঘটিত যৌগ মিশ্রিত হলুদ গোলা জলও পুঁথির কাগজে মাখিয়ে রাখা হ'ত। পাঁচশ' বছর আগে ঐ আর্সেনিক কাকে বলে কেউ-ই জানতেন না।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীতে পাচার করা পালি-প্রাকৃত পুঁথির বেশীর ভাগ-ই বাংলা হরফে লেখা হ'য়েছে। বুঝতে কষ্ট হয় না নেপথ্য শিল্পীদের বেশীর ভাগ-ই বাংলা ভাষা-ভাষী ছিলেন। 'প্রাকৃত কল্পতরু' নামক উদ্ভট নামের কেতাবের পুঁথি—যা ইংল্যাণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আছে, তা বাংলা হরফেই লেখা হ'য়েছিল।" [পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯]।

তাহ'লে, 'তিন হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃত'-নামধারী "আর্য্য"-ভাষা ও আর্য্য-সাহিত্য তথা সংস্কৃতে লিখিত বেদ, সংহিতা, উপনিষদ, ষড়দর্শন, পাণিনী ব্যাকরণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও অপরাপর অনেক "অথেন্‌টিক" পুথি-পুস্তকের যে বিশেষ কোন প্রাচীনত্ব বা ভিত্তি নেই,—নেই অথেন্‌টিসিটি—তা ঠিক। এরকম ভিত্তিহীন লিপি, ভাষা ও সাহিত্য আঠারো-উনিশ শতকে ইউরোপীয় 'আলেম-ওলামা'রা কেবল হিন্দুস্তানের একটা ভাষায় নয়—অনেক ভাষায় তৈরী করেন। সেই সাথে এক-ই রকম 'প্রাচীন অথেন্‌টিক মাল-মাশলা' তৈরী করেন ও করান—তখনকার বৃটিশ-বিশ্বায়নের অধীন, এশিয়া-আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও। ইউরোপীয় মেধা-মনন, মাথা-মগজের এই অসাধারণ কলা-নৌপুণ্যই যে, লণ্ডন-কলকাতার সাংস্কৃতিক দাম্পত্যের বিশেষ অবদান, তা বেশক বলা যায়। সেই সাথে একথাও বলা যায়,—ঐ "দাম্পত্য জীবনে"র পহেলা ফসল রূপে পয়দা হওয়া—'তিন হাজার বছরের পুরানো' "আর্য্য" ভাষা, আর তার অলি-আওলাদগুলো-(বাঙালাসহ অপরাপর তথাকথিত প্রাচীন, মধ্য ও নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষা)র আধুনিক চেহারা যে, ১৮-১৯ শতকেই বানানো এবং নানা জায়গায়, নানা ভাবে গুঁজে রাখা—তা না-কবুল করার উপায় নেই। কেবল ভাষা-সাহিত্য নয়; ইতিহাস, প্রত্নবিদ্যা, স্থাপত্য কোন কিছুই এর বাইরে রাখা হয়নি। তাই ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু-ইউরোপীয় বিশ্বায়নবাদীরাই যে, একটা বিশেষ মতলব নিয়ে বিশ্বব্যাপী একাজ ক'রেছেন এবং হালের আমেরিকান বিশ্বায়নের সময়েও ক'রছেন—তা পষ্ট। এখন দেখা দরকার—সেই মতলব কি এবং বাঙালা ভাষার

'কুলে'র ঠিকুজী জানাতে-বানাতে; তার উৎস দেখাতে—ইউরোপ নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে কেন? আর তা কতটা যুক্তিসংগত ও তথ্য-সম্মত।

১.২ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও ভাষা-গুচ্ছ

উপরের আলোচনায় 'আর্য্য-ভাষা' ও 'আর্য্য-সাহিত্যে'র আসল চেহারা দেখা গিয়েছে। এবার 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা' ও 'ভাষাগুচ্ছে'র ধারণা আর চেহারা-ছুরতের ওপর আলোকপাত করা হবে।

বলা দরকার যে, ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা-চেতনার বাইরে এসে, আলোচ্য বিষয়ে মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা লিখে গেছেন—"আর্য-অনার্যের কথা শুনিলেই আমরা আমাদের চিন্তা ও ধারণাকে সুদূর অতীতে টানিয়া লইয়া যাই এবং ভাবি যে, আলো ও অন্ধকারের মতো দুই স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলে আর্য ও অনার্যেরা বাস করিতেছে এবং সেখান হইতেই মানব-গোষ্ঠীর এই দুই ধারা বহিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ-ধারণা একেবারেই ভুল। আর্য-থিওরীর বয়স এখন মাত্র দেড়শত বৎসর। ইহার পূর্বে কোনো ইতিহাসে 'আর্য' অথবা 'অনার্য' বলিয়া কোনো বিশেষ চিহ্নিত জনগোষ্ঠী অথবা কোনো ভাষা ছিল না। এসব তীক্ষ্ণ শ্রেণী বিভাগ আমরা এখন বসিয়া করিতেছি মাত্র! কাজেই সমস্ত কল্পনাটাই একটা কৃত্রিম আবরণ দিয়া মোড়া। থিওরীটির উৎপত্তি কাহিনী নিম্নরূপঃ—

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের তদানীন্তন চীফ্ জাস্টিস্ এবং 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর প্রেসিডেন্ট Sir William Jones—সোসাইটির এক বার্ষিক সভায় একটি মূল্যবান ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানী, পাহ্লবী, সংস্কৃত প্রভৃতি কতিপয় ভাষার অনেকগুলি শব্দ ও ধাতুরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, ঐ সব ভাষার মূলে ঐক্য রহিয়াছে। তিনি তাই অনুমান করেন, ঐ সব ভাষাভাষীজনেরা আদিতে এক-ই স্থানে বাস করিত এবং এক-ই ভাষায় কথা বলিত। কালে কালে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ইংগিত পাইয়া জার্মান পণ্ডিতদের মনে এক নতুন চিন্তার উদ্রেক হইল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন। Max Mueller, Bopp, Kalaproth প্রভৃতি পণ্ডিত এই বিষয়ে বহু গবেষণা করিলেন। অতঃপর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Sir Thomas Young নামক জনৈক মিসরভাষাবিদ্ পণ্ডিত আলোচ্য ভাষাগুলিকে "Family of Indo-European Language" বলিয়া অভিহিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব

ভাষাভাষী জনগণকে Indo-European Races নামে পরিচয় দেন। ইহার পরই Indo-Aryan এবং Aryan নামের উৎপত্তি হয়।"

কবি গোলাম মোস্তফার এ-বক্তব্যের প্রায় অনুরূপ বক্তব্য লাভ করা যায়—১৯৭১-এ প্রকাশিত আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ্ মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যানের লেখায়। তাঁরা তাঁদের পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন—"While serving in Bengal, India, as a Judge.....Jones became interested in the similarity of many Indian words to English and other European words, similarities that had puzzled other Europeans interested in Indian languages. The Bengali word for father, for example, is *pita* and the word for mother is *mata*. These reminded him of the Latin equivalents *pater* and *mater* (and, for that matter, of most words in European Languages for mother and father). Jones was convinced that, just as the Romance Languages are originally derived from..... an ancient language called *Sanskrit*." (P. 69)। এ-নজীর পেয়ে তিনি নিশ্চিত হন যে, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক এবং জার্মান, স্লাভ, ফারছী এবং আরও অনেক ভাষাই এককালে ছিল বোন-সম্পর্কীয় আর সেগুলো পয়দা হ'য়েছে—"-----from a single original ancestral language, spoken in even earlier times." (P.69)।

জোন্‌স-এর লাগানো এই হ'ল সেই বীজ, যা পরে গত দু'শ বছর ধ'রে বাঙলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান-ইরানসহ গোটা পৃথিবীর ভাষাতাত্ত্বিকদের মাথা গরম ক'রে রেখেছে এবং আন্‌ক্রিটিক্যাল এক-সাম্রাজ্যবাদী (ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদী) ভাষা-বিশ্বায়নের কাল্পনিক জগতে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে।

ফলে, আজও এ-উপমহাদেশ তথা বঙলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইরান প্রভৃতি দেশের ভাষা-তাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকরা 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা' ও 'ভাষাগুচ্ছে'র কল্পিত ধারণার ওপর অগাধ আস্থা রেখে ভাষা-চর্চা ও ইতিহাস-চর্চা ক'রে চ'লেছেন। একেবারে সম্প্রতি এ-তত্ত্ব আমেরিকান-বিশ্বায়নের সাথে জোড়-মিলিয়ে একে আরও জোরদার ক'রে বৃটিশদের হিন্দুস্তান দখল (১৭৫৭)কে জাস্টিফাই করা হ'চ্ছে।

কিন্তু ইতোমধ্যেই কালের কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে এবং ঐ তত্ত্বের ওপর আঘাত এসেছে। নৃবিজ্ঞানীরা ব'লছেন—যে-সব ভাষার কতিপয় শব্দের মধ্যে ও

রকম পারস্পরিক মিল দেখে—তাদের এক প্রাচীন মূল রূপ কল্পনা করা হ'য়েছে—দুর্ভাগ্যজনক হ'ল—সেই মূল ভাষা রূপের কোন লিখিত নজীর দেখানো সম্ভব নয়। তা নেইও। এমন কি... "we don't even know what it was called. " অর্থাৎ আদি ভাষাটাকে কোন্ নামে ডাকা হ'ত তাও আমাদের জানা নেই। (P.70)। জোনস্-এর বক্তব্যের সমালোচনায় নানা ভাষা-পরিবারের উল্লেখ ক'রে ক্লাস ও হলম্যান আরও ব'লেছেন—"These studies seemed to conjure up a very romantic, a very exciting picture. Somewhere back in the dawn of time, the ancestors of the Indo-European-speaking peoples moved out onto the arena of the world, colonizing and conquering as they went. These ancestors, speaking the dialects of the ancestral *Indo-European that were to become in time Latin, Greek, Russian, Sanskrit, and many other tongues, spread over an enormous area of Europe and Asia—from Ireland and Scandinavia in the west and north down through the Mediterranean, across the Middle East to Persia and into the heart of India. In all these places there were other languages, spoken by other peoples. Just as the other nations fell before the hardier newcomers, so—it was agreed—their languages crumbled and disappeared before the strong new Indo-European tongues. In the previous chapter it was noted that conquest is usually considered self-evident proof of superiority. Well, what greater conquest could be pointed to than the fantastic spread of indo-European languages and their speakers ? "Obviously" the speakers were superior to the men they conquered, and the languages to the ones they displaced". (P.72).

কিন্তু অতীতকালে ইউরোপের কোন 'জাতি' কখনও ভারত সহ এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল এলাকা দখল ক'রে নিয়েছিল ব'লে কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া, বিজ্ঞানী-দু'জন আরও ব'লেছেন—"What did these early speakers of Indo-European languages look like, many wondered, and what did they call themselves? Unfortunately, there were no signs or records to indicate that the earliest wanderers had writing. They left no descriptions of themselves, and no pictures. It is only hundreds of years later—perhaps even a thousand or more—that

their descendants in Greece, Rome, Persia and India acquired the art of writing and left records for others to find. When there are no records, imagination can have free rein. The scholars who were studying the Indo-European languages and their speakers were in large measure German (the earlier name for the family of languages, we have seen, was Indo-German), and much of the speculation about appearance seems to have originated in Germany. It was popularly believed that the earliest speakers of *Indo-European must have been a handsome, hardy, warlike people. For northern Europeans the best example of such a people were the Vikings: tall, blond, blue-eyed.

It is customary for people to portray the past in familiar terms. In Italian paintings of the Middle ages, biblical scenes and cities are portrayed as Italian in dress, architecture and appearance. In Holland, on the other hand, biblical personages resemble Dutch townsmen. Gautama Buddha, founder of Buddhism, was born in India, but the Japanese Buddhists portray him as Japanese. It is perfectly understandable, therefore, that northern Europeans imagined that the ancestors of all Indo-European speakers looked like northern Europeans.

It is equally understandable—but particularly important for our understanding of the development of racial ideas—that they equated the spread of the languages with superiority . Not only was it popularly believed that the original *Aryans* (according to the oldest documents in India, **this is what the speakers of Sanskrit called themselves**) were tall and fair, but that they were superior in every way to the peoples they conquered. It was an easy jump to extend this to all the ancient speakers of the Indo-European proto-languages.

Now, it was known of course that civilization was present in most of Europe and Asia in the regions over-run by Indo-Europeans before the coming of the new languages. Before the Greek languages arrived, for example, the Cretans had achieved

a high civilization; the Persians built upon the ruins of Babylonian, Assyrian and Sumerian cities. Perhaps unconsciously, therefore, people seemed to turn to the ancient Greek solution to such a question: as we have seen, the Greeks recognized the high attainments of some "barbarians"—but denied them the full qualities accorded to Greeks. In the same way, many people belived that pre-Indo-European peoples (that is, whoever occupied territory before the coming of Indo-European speakers) were able to achieve some of the steps leading to civilization, but that *true* civilization, *high* civilization, had to await the newcomers. Only with their energy, their ability to think rationally (a characteristic of their languages, it was believed), and their capacity to organize, could civilization as we know it today come into existence.

Thus, we see how the discovery of the relationship of a group of languages scattered over Europe and Asia led to the belief that there was once an ancestral people (or peoples), speaking dialects of a language family superior to all other languages, and themselves intrinsically superior to the peoples they conquered and replaced. Let us emphasize that the evidence for the relationship of the languages was good and was continually buttressed by further work. **But how do you prove that a language is superior to another? And how do you determine the color of the eyes of someone so long dead that hardly a scrap of his bone remains? Even more: how can you demonstrate whether or not present speakers of a language are actually *biological* descendants of those who spoke it thousands of years ago?** After all, people learn new languages, which then replace the old. Arabic has crowded out older languages throughout the territories of Islam; but we know that the present speakers of Arabic are not all descended from the original Arabian conquerers, who brought with them both a new religion and a new language and passed both on to many other peoples. And many Americans, though descendants of

immigrants from all over the world, speak the same English language as that spoken by the descendants of the original immigrants from England.

The linguistic research on the relations between languages in the Indo-European family represented scientific investigation. The other notions were simply popular fancies representing what people would like to believe about their ancestors, with little or no factual evidence to support them".

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের বিরুদ্ধে আরও আধুনিক আপত্তি আছে। দুনিয়ার তাবৎ ভাষার একটি মাত্র উৎস—কোন কালে ছিল কি না, সে-বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হ'য়েছে। স্যার জেরাল্ড ব্যারি, ড. জে. ব্রনোভস্কি, জেমস্ ফিশার ও স্যার জুলিয়ান হাক্সলি-সম্পাদিত "Communication And Language"–(Networks of thought and Action)" এ বলা হ'য়েছে—"Have all languages a commmon origin. Was there once a basic language from which all the past and present tongues have descended? Unfortunately there is no way of knowing wether there was a basic language in the distant past; and the reason for saying this are fairly straightforword.

First if we had a written specimen of every language right back to the beginning, and if we could decipher them all, we could certainly decide for against a common origin.

Also we know from our present and past languages that there is no connection between sound and meaning ....We also know that sound-changes in words occur with the passing of time , and that these are random changes. And since man has been talking for many thousands of years, there must have been so many random sound-changes that it is now impossible to decide whether all languges have a common source.

Some linguists have felt so strongly about this that they have considered it waste of time even to speculate about the origin of language." (Page 54-55).

বলা দরকার যে, মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যান 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষা'র যে শ্রেণীভাগ ক'রেছেন*, তার সাথে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখের শ্রেণী-ভাগ মেলে না। খেয়াল ক'রলে দেখা যায়—

১. মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যান—ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকে গজিয়ে ওঠা দু'টো শাখার একটার নাম দিয়েছেন—"আনাতোলিয়ান"; আর অন্যটার নাম "থ্রাকো-ফ্রিজিয়ান"।

অপরদিকে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ দু'টো শাখার নাম দিয়েছেন—যথাক্রমে 'কেন্তুম্' ও 'শতম্'।

২. মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যানের মতে—বাল্টিক, কেন্তুম্ গ্রুপের ভাষা; কিন্তু আলবানিক, শতম-শাখাভুক্ত।

অপরদিকে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-প্রমুখের মতে উভয় ভাষা-পরিবার-ই শতম্ শাখার।

৩. মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যানের মতে গ্রীক, কেন্তুম শাখার ও ইতালিক, শতম্ শাখার ভাষা।

অন্যদিকে,—ড. শহীদুল্লাহ্-প্রমুখের মতে—গ্রীক ও ইতালিক দু'টোই কেন্তুম শাখাভুক্ত।

৪. মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যানের মতে—বাল্টিক ও কেল্টিক উভয়-ই কেন্তুম শাখা-পার্শ্বিক।

অপর দিকে, ড. শহীদুল্লাহ্-প্রমুখের মতে কেল্টিক—কেন্তুম ও বাল্টিক—শতম্ শাখা-পার্শ্বিক।

৫. উক্ত নৃবিজ্ঞানীদ্বয় তাঁদের ভাষা-বৃক্ষে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার উল্লেখ ক'রলেও ইন্দো-ভারতীয় আর্যভাষার কথা বলেননি।

৬. তাছাড়া, ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুচ্ছের দু'টি প্রধান শাখার একটিতে ইরানী ভাষা, আর অপরটিতে—(ভারতীয় শাখায়) হিন্দুস্তানী, উরদু ও বাঙালার নামোল্লেখ করা হ'য়েছে। কিন্তু আবেস্তান ও বৈদিক ভাষার কোন উল্লেখ-ই করা হয়নি।

৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-নিরূপিত তালিকায় নিহিত 'ব্রজবুলি' ও 'মৈথিলী'

* মর্টন ক্লাস ও হেলম্যানের প্রদত্ত চার্ট পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যান ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বৃক্ষের যে-চিত্র ১৯৬৩ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'কলাম্বিয়া এনসাক্লোপিডিয়া' থেকে তুলে দিয়েছেন, সেটি নিম্নরূপ—

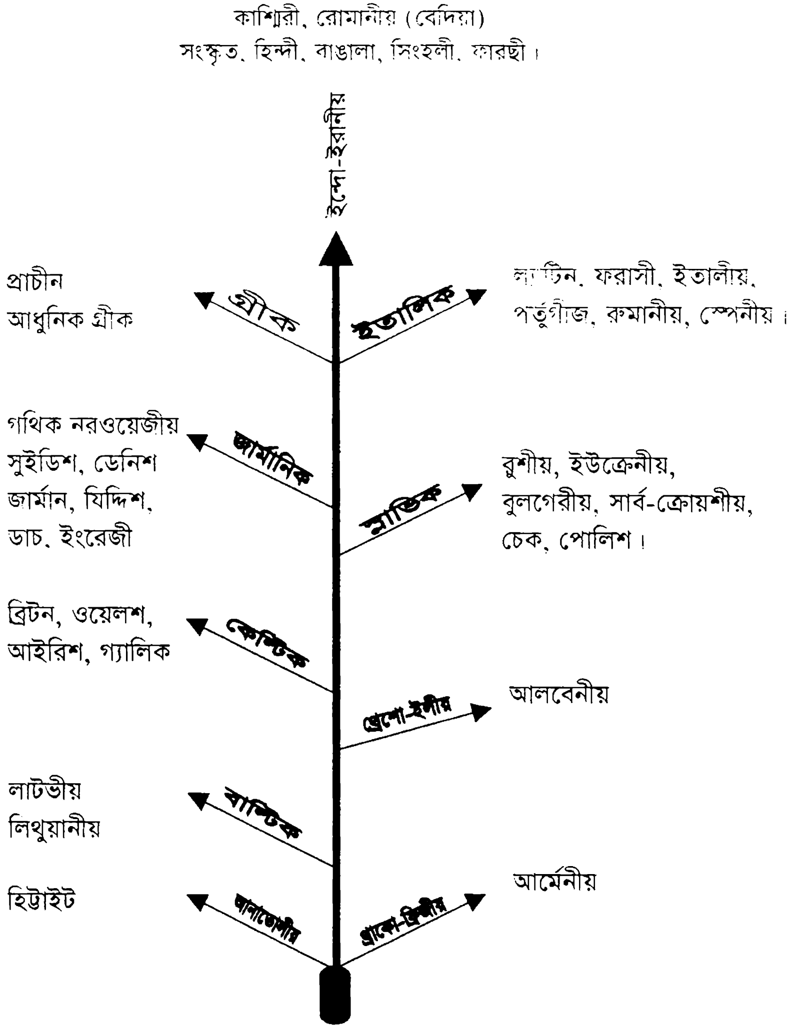

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ*

---

*এ-চার্ট যুগ-অনুযায়ী নয়, হরফানুক্রমিক ভাবে সাজানো। (P.71).

ভাষা যে, ঐ নামের প্রকৃত কোন ভাষা ছিল না—তা এই লেখক ইতোপূর্বে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন।*

এভাবে, নানা সূত্রে, নানা জনের তৈরী করা বিবিধ 'ভাষা-চার্ট' পরীক্ষা ক'রলে—এরকম মতভেদ বা পার্থক্য আরও পাওয়া যায়। এ-তরফে আরও কথা বলা যায় যে, ড. গ্রীয়ার্সন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ যে-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুচ্ছ তালিকাভুক্ত ক'রেছেন—সেগুলোর মাঝে ২৭ টা কাল্পনিক ও ২২ টা মৃত ভাষা। এগুলোর কোন কোনটা যে, অনৈতিহাসিক তাও পষ্ট। অতএব, গোটা ভাষা-প্রকল্পই যে, এক বিশাল কাল্পনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত—তা কবুল না ক'রে উপায় নেই।

অতএব, ইন্দো-ইউরোপীয় তো বটেই অনুরূপ যে-কোন ভাষা-কওমের মূল বা উৎস আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব। সে কারণেই আর্য্যত্ববাদী ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ ভাষাভাত্ত্বিকদের মত বর্ণ ও সভ্যতাগর্বীরা যখন "কালচার এরিয়া" বা 'কৃষ্টিক-শ্রেষ্ঠ-এলাকা'র সূত্রে ভাষাকে ভিত্তি ধ'রে ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরাণীয় বা ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বকে জাহির করার চেষ্টা করেন; তখন তাঁরা ভাষার সাথে যুক্ত ধর্ম, সামাজিক সংগঠন এবং সমকালীন রাজনীতি, সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃৎকৌশলের কথা ভুলে যান। ভুলে যান আরবীয়, ভারতীয়, স্পেনীয় মুছলিম-শক্তি ও সভ্যতার কথাও। তাই ফ্রাঞ্জ বোয়াজ ব'লেছেন—"If culture areas were based on language, religion or social organization they would differ materially from those generally accepted.

Applying this consideration to the history of the peoples speaking Aryan languages we conclude that this language has not necessarily arisen among one of the types of men who nowadays speak Aryan languages; that none of them may be considered a pure , unmixed, descendant of the original people that spoke the ancestral Aryan language; and that furthermore the original type may have developed other languages beside the Aryan." (P.146-'47).

এভাবে 'কালচার-এরিয়া-পয়েন্ট অব্ ভিউ' থেকে 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা'র কাল্পনিক তত্ত্ব যেমন টেকসই হয় না; তেমনি সমকালীন ভাষা ও কৃৎকৌশল

* দেখুন. ড. এস.এম. লুৎফর রহমান। "ব্রজবুলি কি বৃন্দাবনের ভাষা. না বাঙালা ভাষা?" সাহিত্য পত্রিকা. ৪৬শ বর্ষ. ১ম সংখ্যা-২০০৪।

-(Technology) এর সমন্বিত বিচারেও ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়।

সেদিক থেকে বিচার-বিবেচনার ফলাফল জানাতে আর স্কুপিন ও সি. আর. ডি. কোর্স লিখেছেন—বৃটিশ আর্কিওলজিস্ট কলিন রিনফ্রিউ...."suggests that the Indo-European languages spread throughout Europe from an original homeland in Anatolia, today part of Turkey, as early cultures adopted intensive agriculture."(P. 259). কিন্তু তুর্কীরা ইউরোপীয় নয়।

পরম কাল্পনিক এই ভাষা-পরিবার নিয়ে তাই বহু রকম বিচার-বিবেচনার পর—"Modern historical linguists agree that they probably can never reconstruct the original language...."(P. 258).

এখানেই শেষ নয়। কারণ ভাষা-পরিবার বা হালে—'ভাষা-বৃক্ষ'—যা-ই বলা হোক না কেন; তার আসল গলদ কোথায়, সেটাই বিবেচ্য। ভাষা-পরিবার ব'ললে, তার আদি দম্পতি থাকতেই হবে। এর ফয়ছালা সহজেই হয়—যদি মানবজাতির আদি আব্বা-আম্মা হিসেবে আদম-হাওয়াকে মেনে নেয়া হয়। তাহ'লে, তাঁদের ভাষাকেই বিশ্ব-ভাষারাজির মূল ব'লে কবুল করা যায়। এ-বিষয়টিকেই একটু সায়েন্টিফিক করার খাতিরে 'ভাষা-পরিবারে'র বদলে আধুনিক কালে 'ভাষাবৃক্ষে'র কল্পনা করা হ'য়েছে। তাও আদি ভাষা-অঙ্কুরের জন্য একটা 'বীজ' (seed) লাগে। তার-ই বা খোঁজ পাওয়া যাবে কোথায়?

অতএব, 'পরিবার' বা 'বৃক্ষ'-ধারণা বাদ দিয়ে যদি 'ভাষা গুচ্ছে'র ধারণা কবুল করা হয়; তাহ'লে কিছু বাস্তব চিন্তা-ভাবনার ছোহবত (স্পর্শ) লাভ করা যায়। কারণ আদিতে এক ব্যক্তি (আদম আ.), এক দম্পতি (আদম ও হাওয়া), এক ভাষা (তাঁদের কথিত) থাকলেও পরবর্তী কালে তা বহু জনকওমে, বহু রূপে, বহু ভাগে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। এর ফলে, বর্তমান কালের মতই হাজার হাজার বছর আগেও নানা এলাকায়, নানা ভাষা পয়দা হয়। সেই সাথে এক-ই এলাকার (বিশাল এলাকা হ'লে) নানা অংশে এক-ই ভাষার নানা চেহারা-ছুরতেরও সৃষ্টি হয়। ফলে, কিছু কিছু ভাষার মধ্যে ঐক্য যেমন দেখা যায়—তেমনি দেখা যায় ভিন্নতাও। তবে, এ-সব-ই সত্য কেবল 'জীবিত' বা চালু ভাষার বেলায়। কোন কৃত্রিম বা 'মরা' ভাষার চেহারায় এমন শীত-বসন্তের ছোঁয়া লাগে না। ('সংস্কৃত' সেই কিছিমের একটি 'মরা ভাষা'।) অতএব, জীবিত ভাষার ভিত্তিতেই এক-একটি ভাষাগুচ্ছের বিচার করা অবশ্যক।

তাছাড়া, উইলিয়ম জোন্‌স 'বাঙালা'র নামে যে-সব 'সংস্কৃত' শব্দরূপ ও ধাতু দেখে, বেছে নিয়ে—ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরেজী ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে অবাক হ'য়েছিলেন— আসলে সেই সব শব্দ বাঙালার মূল ধারার শব্দ ছিল না। সেগুলো ছিল—সংস্কৃত থেকে আনা শব্দ—সংস্কৃতজ শব্দ। আর খোদ্ সংস্কৃত ভাষাটাই যে, নানা এশীয়-ইউরোপীয়, প্রাচীন ভাষা থেকে শব্দ এনে আঠারো-উনিশ শতকে তৈরী ক'রে নেয়া হ'য়েছিল—সে-খবর আগেই দেয়া হ'য়েছে। কাজেই ঐ সব শব্দ বাদ দিয়ে যদি 'পিতা'র বদলে আব্বা/বাবা, 'মাতা'র বদলে আম্মা/মা, 'ভ্রাতা'র বদলে ভাই/দাদা ধ'রে—মিল খোঁজা হ'ত—তাহ'লে ঐ গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান (ডয়েট্শ), ইংরেজীর মধ্যে কোন সমধর্ম দেখানো যেত না। একজন বাঙালী হিন্দু পণ্ডিত লিখেছেন—"আইসল্যাণ্ড" নামটি নাকি "ঈশলিঙ্গ" (শিবলিঙ্গ) থেকে পয়দা হ'য়েছে। (ঈশ=আইস্/Ice; লিঙ্গ–উচ্চারণ 'লিঙ্গো' বিধায়, শব্দটা এসেছে land থেকে। উচ্চারণ 'ল্যাণ্ডো' ধ'রে) তা যদি হয়; তবে কি একথা বলা যায় যে, খোদ 'ইশ' শব্দটাই এসেছে 'আইশ' (মাছের আঁইশ), বা 'আইস' (এসো, come-অর্থে)থেকে? এদুটো শব্দর সাথে 'আইস' (Ice) শব্দটা তো বেশ মিলে যায়। এরকম ধ্বনি মূলক শব্দ-সাদৃশ্যে তাই এমন দাবীও করা চলে যে, 'আইস' (Ice) শব্দটার মূল 'বাঙালা ভাষা'ই! কাজেই স্যার উইলিয়ম জোনস ও তাঁর শাগরেদ্‌দের ছবক মানতে হ'লে, এও মানা দরকার যে, সংস্কৃত 'হস্ত' শব্দ এসেছে—ফারছী 'দস্ত' থেকে; ল্যাটিন থেকে নয়। সংস্কৃত 'বন্ধ' এসেছে— ফারছী 'বন্দ্' থেকে; ল্যাটিন থেকে নয়।সংস্কৃত 'স্থান' এসেছে—ফারছী 'স্তান' থেকে; ল্যাটিন থেকে নয়। সংস্কৃত 'বহি' (book এসেছে–ফারছী 'ওহি' থেকে; ল্যাটিন থেকে নয়।

এরকম ভাবে, ফারছী, আরবী শব্দের সাথে সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্যের বেশুমার নজীর হাজির করা যায়। আর তা ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান এবং ধ্বনি-বিজ্ঞান-বিচারে সংগতও বটে।

অপর দিকে, একথা কে ব'লবেন যে, খোদ্ 'ইন্দো' (Indo/Hindoo/Hindu) শব্দটাই মূল আরবী 'হিন্দ্' (হিন্দ্—গোত্রনাম, হিন্দা/হিন্দাল–ব্যক্তি নাম) থেকে আসেনি?

২

ভাষাতত্ত্বের অন্য ইশারা

ইতোপূর্বে বলা হ'য়েছে—"আর্য" শব্দটা আঠারো শতকের শেষ ভাগে কলকাতার 'মগজ ধোলাই কারখানা'য় তৈরী। তাহ'লে, এ-শব্দটা কোন্ শব্দ থেকে

পয়দা হ'ল—তা খুঁজে দেখা যেতে পারে। আর সেখানেই হয়তো র'য়েছে—তথাকথিত আৰ্য্য ধর্ম, আৰ্য্য ভাষা ও আৰ্য্য জাতির আদি পরিচয়। তাঁদের ভাষা—ধর্ম, সাহিত্য, বাস-বসতি আর জনকওমেরও মূল ঠিকানা।

এতথ্যের তত্ত্ব-তালাশে ভাষা-বিজ্ঞানের শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের সহায়তা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এ-তরফে বলা দরকার, মশহুর ভাষা-বিজ্ঞানী মরহুম মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন—"এক এক সমাজের সকল মানুষের অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভাষা-তাত্ত্বিকরা ভাষার উৎপত্তি ও মূল খুঁজতে কত না চেষ্টাই ক'রেছেন। কেউ ব'লেছেন ভাষা খোদার দান। কেউ ব'লেছেন, কোনো একটি ভাষা থেকে দুনিয়ার সব ভাষার কিংবা অনেকগুলো ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি । বিংশ শতাব্দী-পূর্ব যুগে এমনি ভাবে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ অনুসন্ধানে ভাষাতাত্ত্বিকদের সাধনা নিয়োজিত হ'য়েছে। আমাদের এ-শতাব্দীর গেলো বিশ- তিরিশ বছর ধ'রে ইউরোপ-আমেরিকার ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষা সম্বন্ধে এ-ভাবের চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমান যুগের চিন্তার মূল হ'চ্ছে—তা যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেই হোক না কেন, মানুষ যা ভাবছে বা ক'রছে, হাতে-নাতে তার কোনো না কোনো প্রমাণ পেতে হবে, গবেষণাগারে কেটে-ছিঁড়ে তা দেখতে হবে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাষার মূল এমনি ভাবে অনুসন্ধান ক'রতে গিয়ে বর্তমান যুগের চিন্তা-নায়কেরা ভাষার মূলে কতকগুলো অর্থবোধক ধ্বনি ছাড়া আর কিছু পাননি। ধ্বনি-ই যে ভাষার মূল তা সহজে বোঝা যায়— যখন যাদের ভাষা জানি না, কমপক্ষে এমন দু'জন লোককে তাদের পরস্পরের মধ্যে কতকগুলো ধ্বনি বিনিময় করে ঠিক আমাদের-ই মত হাসতে-কাঁদতে দেখি।" (পৃ. ২৮০)।

কিন্তু ধ্বনিগত মিল থাকলেই, এক ভাষার সাথে অপর ভাষার 'রিশ্‌তা' (আত্মীয়তা) মেলানো যায় না। কারণ, যে-কোন দু'টি ভাষার দু'টি শব্দের মধ্যে ধ্বনি-মিল দেখা গেলে, তার সাথে ঐ দুই ভাষাভাষী দু'টি জনকওমের স্থান-কালগত ঘনিষ্ঠতাও বিবেচনা ক'রতে হবে। নইলে 'ঈশলিঙ্গে'র সাথে 'আইসল্যাণ্ডে'র মিল দেখে আইসল্যান্ডিক ভাষা থেকে সংস্কৃতের জন্ম বা সংস্কৃত থেকে আইসল্যাণ্ডিক ভাষার জন্ম মেনে নিতে হবে। অথবা বাঙালা ভাষা থেকে আইসল্যাণ্ডিক ভাষার জন্ম—কবুল ক'রতে হ'বে। কাজেই যে-কোন দু'টি বা তার বেশী ভাষার শব্দসাদৃশ্য যদি সে-সব ভাষা-ভাষী জনগণের মধ্যে—নিকট অতীতে বা সদূর অতীতে কোন নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও

সাংস্কৃতিক মেলামেশার নজীর না থাকে; তবে শব্দ-সাদৃশ্য কোন তাৎপর্য বহন করে না। কারণ জনকওমগত দীর্ঘস্থায়ী 'ফ্রী ইন্টারঅ্যাকশন' ছাড়া এক বা একাধিক জাতির ভাষা পরস্পর মিশে যেতে পারে না। একমাত্র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চাপ বা জবরদস্তি-ই পারে, এক জাতির লিপি-ভাষা-সাহিত্যকে অপর জাতির লিপি, ভাষা ও সাহিত্যের ওপর চাপিয়ে দিতে। তার বদল ঘটাতে।

এসব কথা মনে রেখে এবার 'আর্য্য' শব্দ কিভাবে পয়দা হ'ল—তার তত্ত্ব-তালাশ করা যেতে পারে।

আর্য্য শব্দের উৎপত্তি

আগেই বলা হ'য়েছে যে, হালের ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান, ভারত ও চীনের নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে বর্ণবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ-বিরোধীরা গোটা 'আর্য্যতত্ত্ব-প্রকল্প'ই না-কবুল ক'রে; আর্য্য-ভূমি, আর্য্য-ভাষা, আর্য্য-জাতির উল্লেখ থেকে বিরত থাকছেন। আর কেউ আর্য্য-ভূমির খোঁজ না পেয়ে ব'লছেন—'আর্য্য-ভাষা আছে; জাতি নেই'। কখনও ছিলও না। তাই তাদের আদি বসবাসের কোন হদিছ মেলে না। একথা কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যে—তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে, পুরো বিষয়টা ভাষাতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায়—তথাকথিত আর্য্যদের নির্দিষ্ট দেশ, ভাষা ও জাতি-পরিচয়—ঐ "আর্য্য" শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে। আর তা হ'ল—'ইউরোপীয়ান' ও 'অ্যারিয়ান' শব্দের মধ্যে যতটা মিল আছে; তার থেকে বেশী মিল র'য়েছে 'অ্যারিয়ান' ও 'অ্যারাবিয়ান' শব্দের মধ্যে। এরকম মিল র'য়েছে–'আর্য্য' আর 'আরব্য' শব্দ দু'টোর মাঝেও। মিলগুলো এরকম—

১. Europe = Urope = Arob = Arab.
২. European = Uropean = Arobian = Arabian.
৩. Aryan =Arabian = (European কি?)।
৪. আর্য্যান্ =Aryan = Arabian.
৫. আর্য্য=আর্ব্য = আরব্য।
৬. আরযীয়=আরবীয়।

নজর ক'রলে দেখা যায়—'আর্য্য' লিখতে শেষ হরফটি অন্তঃস্থ—'য' এবং 'ঈয়' প্রত্যয় লেগেছে। আবার 'আরব্য' লিখতেও দরকার হ'য়েছে—অন্তঃস্থ-'ব' ও

'ঈয়'-প্রত্যয়। তাহ'লে অন্তঃস্থ-'য' ও অন্তঃস্থ-'ব' যে সমধ্বনির, সমমানের, সমমূল্যের এবং একে অন্যের বিকল্প—তা কবুল করা চলে।

উপরের নজীরগুলো থেকে ছাফ জানা যায়, ইংরেজী 'অ্যারাবিয়ান' আর 'অ্যারিয়ান' শব্দের মধ্যে যেমন বিশেষ কোন পার্থক্য নেই; তেমনি—'আরব্য' আর 'আর্য্য' শব্দ দুটোর মধ্যেও কোন ফারাক নেই। এক-ই কথা বলা যায় 'আর্য্য' এবং 'আর্ব্য' শব্দ দুটো সম্পর্কেও। এ -তরফে বলা দরকার, 'আর্ব্য' শব্দটি নতুন এবং এরকম শব্দ নেই—তা ঠিক। কিন্তু 'তরজমা' এবং 'তর্জমা', 'বরষা' ও 'বর্ষা' প্রভৃতি শব্দ যদি এক হয়; তাহ'লে 'আরব্য' আর 'আর্ব্য'ও এক-ই। অসংগত কিছু নয়।

এই ভাষা-তাত্ত্বিক তুলনামূলক সাদৃশ্য থেকে একথা বলা অসমীচীন নয় যে, 'আর্য্য' শব্দটা 'আরব্য' শব্দের সাদৃশ্যে তৈরী এবং 'Aryan' শব্দটা 'Arabian' শব্দের-ই ভিন্ন রূপ মাত্র। শুধু 'আর্য্য' নয়; তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে এরকম আরও অনেক সাধারণ-অসাধারণ বাঙালা এবং সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে আরবী শব্দের সাদৃশ্য দেখানো যায়। কিন্তু সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। তাই এখানে শব্দতত্ত্ব ব্যতীত—এবার আরবীয় জনগোষ্ঠী এবং ভারতীয় (আর্য্য) জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক-জাতিতাত্ত্বিক প্রকৃতি-(Nature) পর্যবেক্ষণ ও অপর কিছু বিশেষ তথ্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া দরকার। তা হ'ল—দৈহিক নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আরবীয়দের সঙ্গে ভারতীয় 'আর্য্য ব্রাহ্মণ'দের সাদৃশ্য প্রকট ।দৈহিক গড়ন—গাত্র-বর্ণ, নাসিকার ধরণ, কপালাকৃতি, দেহ-দৈর্ঘ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে দু'টি জনগোষ্ঠী যে, এক-ই পূর্বপুরুষ থেকে আগত—জেনেটিক্স্-এর সিদ্ধান্তাবলীর কিছু মাত্র মূল্য থাকলে, তা কবুল না ক'রে উপায় নেই।

তাছাড়া, জন-প্রকৃতি বিচারে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যরা ছিল,—'ঘোড় ছওয়ার' এবং 'পশু পালক'। 'আরবীয়'রাও কি তাই নয়? 'আর্য্য'রা নাকি ছিল নির্মম, নিষ্ঠুর এবং যাযাবর। প্রাচীন আরবীয়রাও কি তাই নয়? 'আর্য্যরা' নাকি চিরকাল 'বর্ণবাদী' তথা বংশ-গোত্র ভাগে বিভক্ত এবং বংশ বা সম্প্রদায়গত স্বার্থে অন্ধ। আরবীয়রাও কি তাই নয়? 'আরবীয়'রা ছিল মূর্তি-পূজক। ভারতীয় 'আর্য্য'-রাও কি তাই নয়? 'আরবীয়'রা চিরকাল-ই অকৃষক এবং মাংসাহারী। ভারতীয় 'আর্য্যরা'ও কি তাই নয়? আর একারণেই কি ভারতীয় আর্য্য-(ব্রাহ্মণ)রা ব্রাহ্মণদের (নিজেদের) জন্য কৃষিকর্ম ও মৎস্যাহার নিষিদ্ধ করেনি? মরুভুমিতে মাছ মিলত না

ব'লে, যারা কখনও মাছ খেত না; তারাই হিন্দুস্তানে এসে, স্বজাতির (ব্রাহ্মণদের) জন্য মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এছাড়া, ভারতের একাধিক ব্রাহ্মণ-বংশ আজও নিজেদের আরব দেশাগত বনেদী খানদান (পরিবার) ব'লে দাবী ক'রে থাকেন। ভারতের কট্টর জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতারা এখন ব'লেন—মক্কার 'কা'বা' ঘর ছিল—তাঁদের-ই 'দেব-মন্দির'; সেটা একদিন তাঁরা ফের দখল ক'রে নেবেন।

এছাড়া, প্রাচীন ভারতে, কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে আরবী ভাষারও প্রচলন ছিল। কোন ইউরোপীয় ভাষা নয়। আরবী ভাষা। কথাটা ব'লেছেন, শুদ্ধি-আন্দোলনের নেতা চরম মুছলিম-বিদ্বেষী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। তাঁর 'সত্যার্থ-প্রকাশ'-গ্রন্থের দশম অধ্যায় থেকে জানা যায়; কুরু-পাণ্ডবরা নিজেদের মধ্যে গোপন শলা-পরামর্শ ক'রত—'আরবী ভাষায়'। তাহ'লে, তাদের প্রাচীন জনপ্রবাহ আরব দেশাগত না হ'য়ে, অ্যাল্‌পাইন হ'লে—তাঁরা আরবী ভাষাটা পেল কোথায়?

কেবল 'আর্য্য" শব্দ নয়, 'হিন্দু', 'ব্রাহ্মণ', 'হরি', 'নারায়ণ', 'কৃষ্ণ', 'গীতা', 'ভরত', 'ভারত', 'ব্রজ', 'লব', 'কুশ', 'সীতা' প্রভৃতি অসংখ্য সংস্কৃত ও বৈদিক শব্দের সঙ্গে আরবী ভাষার যেমন অতি ঘনিষ্ঠ বিচিত্র রকম সম্পর্ক র'য়েছে; ইউরোপীয় ভাষার ইংলিশ, ল্যাটিন, গ্রীক, ডয়েট্‌শ (জার্মান), ভাষার সঙ্গে তা নেই।

এক-ই ভাবে আরবীয় বংশ ও গোত্র-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার সাথে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের বর্ণ ও গোত্রগত সমাজ-ব্যবস্থার যে আবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে; তা কোন ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায় না।

এসব কারণে, আর্য ভাষার সঙ্গে কোন ইউরোপীয় ভাষার বা ভারতীয় আর্য্যজাতির সঙ্গে কোন ইউরোপীয়-আর্য্য জাতির মিলমিশ হবার কোন সম্ভাবনা প্রাচীন কালে ছিল না। 'আর্যরা' ভারতে এসেছিল প্রাচীন মেসোপটেমীয় এলাকা থেকে—যা আরব দেশের-ই অংশ। এটাই বৃটিশ পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত। এ-বিষয়ে আরও তথ্য আছে।

এছাড়া, আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌দের নিকট 'ওল্ড ওয়ার্ল্ড' (Old World)-নিউ ওয়ার্ল্ড'-(New World)-এর যে-ধারণা চালু র'য়েছে, সে-অনুযায়ী, এশিয়া ভূখণ্ড থেকে বিশেষতঃ উপসাগরীয় অঞ্চল থেকেই প্রাচীন কালে জনস্রোত আফ্রিকা-ইউরোপ ও তারপর আমেরিকায় হিজরৎ ক'রেছে। উল্টোটা নয়। অর্থাৎ ইউরোপ

থেকে কোন জাতি প্রাচীন এশিয়ায় আসেনি। হিন্দুস্তানে তো নয়-ই।

অতএব, ইন্দো-ইউরোপীয় 'জনসত্তা' ব'লে যেমন কোন জনকওম প্রাচীনকালে ছিল না; তেমনি 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা' (তথাকথিত Indo-European Parent Speech) ব'লেও কোন আদি ভাষা-কওম ছিল না। বরং এশিয়াতেই যে আদি ভাষা ও আদি লিপির জন্ম—তা একাধিক সূত্রে জানা যায়।

এ-পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত ধ্বনি সাদৃশ্যমূলক শব্দগুলো সাজালে গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হ'তে পারে। যথা—

১.Arab>Arob>Urope (b=p)> Europe (U=Eu)
২. Arabian > Arobian> Uropean>European
৩. Arobian > Aryan
৪. Arabian > Aryan (আর্য্যান্)
৫.আরব্য > আরবীয় > আর্য্য।

অতএব, আর্য্য শব্দটি যে, আকাশ থেকে পড়েনি; 'আরব্য' শব্দ থেকে তৈরী এবং তা প্রাচীন আরবীয় জনপ্রবাহের দেশান্তর, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব-ধ্বনিতত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ—তা পষ্ট।

৩

তাই ইউরোপের কোন পাহাড়-পর্বত নয়; এশিয়ার আরব ভূমি-ই যে আদি আদম, আদি লিপি, আদি ভাষা ওগয়রহের পয়দা-স্থল, তা আধুনিক লিপিতত্ত্ববিদ্‌রাও কবুল ক'রেছেন। এ-বিষয়ে, এ.সি.মুরহাউস 'রাইটিং অ্যাণ্ড দি অ্যাল্‌ফাবেট্-(Writing And The Alphabet) গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় ব'লেছেন—"বস্তুতঃ বর্ণমালা আছে মাত্র একটি-ই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাই ছড়িয়েছে এবং বিভিন্ন ছদ্মরূপ ধারণ ক'রলেও মূলে যে তা এক-ই, তাও চাক্ষুষ দেখানো যায়। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ সব-ই লেখা দেবনাগরী লিপিতে; মুছলিমদের কোরান লেখা আরবী লিপিতে, ওল্ড টেস্টামেন্ট হিব্রুতে এবং নিউ টেস্টামেন্ট লেখা গ্রীকে। এই সমস্ত লিপি বস্তুতঃ এক-ই মূল উৎস থেকে উদ্গাত, এবং তার-ই নানান রূপভেদ মাত্র। খৃ.পূ. দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ দিকে নিকট-প্রাচ্যে বিশেষতঃ সিরিয়া ও প্যালেস্তাইনে ব্যবহৃত ঈষৎ-ভিন্ন এক গুচ্ছ সেমিটিক বর্ণমালা তাদের উৎসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।" মিঃ মূরহাউস আরও ব'লেছেন—"সেমিটিক লিখনের (কয়েকটি শাখার মধ্যে) আর-এক শাখা প্রাচীন

ভারতের খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী বর্ণমালা।" 'খরোষ্ঠী' ও 'ব্রাহ্মী' বর্ণমালার ভারতীয়ত্ব ও মৌলিকত্ব নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হ'য়েছে।

তবে লেখকের তৃতীয় বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় শেষ ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন—"এই অধ্যায় শেষ করার আগে আমরা সংক্ষেপে ইউরোপীয় লিপির উল্লেখ ক'রব। দক্ষিণ সেমিটিক থেকে উদ্ভূত, সম্ভবতঃ তা সাবা দেশীয় (সাবা হ'লো বাইবেলোক্ত রানী শেবার দেশ)। এখানে স্বরবর্ণ-সমস্যা মেটানো হ'য়েছিল এই উপায়ে—সেমিটিক ব্যঞ্জন-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, ব্যঞ্জন যোগ 'অ' বোঝাতে (যেমন ভারতে); অন্যান্য স্বরবর্ণের জন্য বিশেষ মাত্রা যোগ করা হ'ত—কিন্তু ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্নের মত পৃথক না থেকে তা স্থায়ী ভাবে ব্যঞ্জন-চিহ্নের সঙ্গে মিশে যায়।"

অতএব, কেবল ব্রাহ্মী লিপি ও বৈদিক ভাষা নয়; সংস্কৃত লিপি, বৈদিক ভাষা এবং আর্যত্ববাদী ব্রাহ্মণ জনকওমের প্রাচীন পুরুষ-মহিলারা যে, সেমিটিক (আরব) অঞ্চল এবং সেমিটিক (আরবীয়) জনকওমের-ই অন্তর্ভুক্ত —ইউরোপ আর ইউরোপীয়ানদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই কিংবা ছিল না—তা পষ্ট।

মোটের ওপর' মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হন; তেমনি আদি মানবগোষ্ঠী, ভাষা ও লিপিরও পয়দায়েশ এখানেই। সেই হেতু যে-ভাষাগোষ্ঠীকে 'ইন্দো-ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পীচ' বলা হ'য়ে থাকে; তা আসলে 'সেমিটিক-প্যারেন্ট স্পীচ' বা 'সেমিটিক মূল ভাষা' বলা উচিত। নির্দিষ্ট অর্থে এই ভাষাটি 'আরবী', আরবীয় বা আরব্য। আর এই 'আরব্য' শব্দটিকেই ম্যাক্সমূলার বানানের বিকৃতি ঘ'টিয়ে ক'রেছেন—"আর্য্য"।

অতএব, ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা বা 'ইন্দো ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পীচ'-এর তরফে যত কথা, যত যুক্তি-ই দেয়া হোক না কেন; তা না-কবুল করার পক্ষে বহু যুক্তি আছে।

এবার দেখা যাক, ইন্দো-সেমিটিক ভাষাগুচ্ছের পরিচয় কি এবং ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন, মধ্য ও নব্য যুগের নানা রকম ভাষার সাথে তার সম্পর্ক কেমন।

ক) ইন্দো-সেমিটিক ভাষা-কওম

বলা দরকার যে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুচ্ছের মত 'ইন্দো-সেমিটিক

ভাষা-পরিবার', 'ভাষাবৃক্ষ' বা 'ভাষাগুচ্ছে'রও কল্পনা করা হ'য়েছে। গ'ড়ে তোলা হ'য়েছে—একটা আলাদা ভাষা-প্রকল্প। আর তা এক-ই সময়ে।

হিন্দুস্তানে (ভারতে) যখন এশিয়াটিক সোসাইটির মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্যার উইলিয়ম জোন্‌স 'আর্য্য ভাষা-পরিবার- তত্ত্ব' নিয়ে 'ওয়াজ' ক'রছিলেন; প্রায় ঠিক সেই সময়ে ১৭৮৭ খৃ. অব্দে জোহান গট্‌ফ্রেড ইকোহরণ, তাঁর সম্পাদিত 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর ভূমিকায় 'সেমাইট'-শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯২৩ সালে উইলিয়ম রাইট 'এ কম্পারেটিভ গ্রামার অব্ সেমিটিক ল্যাঙ্গুয়েজ' নামক বইয়ে ব'লেছেন—'শব্দটি সুবিধেজনক উদ্‌ভাবন বটে, তবে বিজ্ঞান-সম্মত নয়।' 'সেমিটিক ল্যাংগুয়েজ'-এর এই সেমিটিক শব্দ নিয়ে আরও আপত্তি আছে। সে-বিষয়ে আলোচনা করার আগে বলা দরকার, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা আছমানী কিতাব তৌরাত-এর কথা অনুযায়ী হজরৎ নূহ-(আঃ) এর সময় দুনিয়া জুড়ে যে মহা বন্যা হয়, তাতে বিশ্বাস করেন। ঘটনাটি পাক কোরআনে স্থান পাওয়ায় এবং ভূতাত্ত্বিক গবেষণায়ও তার আলামত থাকায়—সারা দুনিয়ার প্রায় সবাই তার ওপর আস্থাশীল। তৌরাতে বলা হ'য়েছে যে, মহা বন্যার পর হজরৎ নূহ (আঃ) আর তাঁর তিন পুত্র জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম—হাম, সাম ও ইয়াফিস্। ধারণা করা হয়—'আধুনিক বিশ্বের সকল নর-নারী এই তিন জনের অলি-আওলাদ'। তথাকথিত সেমাইট বা সেমিটিকরা এই নূহ-তনয় সাম-এর অলি-আওলাদ। এই জনকওম-ই পরে বংশ-বিস্তার ক'রে জাতিতে পরিণত হয়। আর সে-জাতির নাম-ই সামী-জাতি বা 'সেমিটিক রেস' (Semitic Race)। এ-সেমিটিক রেস-এর ভাষাই হ'ল—প্রোটো ইন্দো-সেমিটিক ভাষা বা প্রাচীন ও আধুনিক ইন্দো-সেমিটিক ভাষার উৎস।

কিন্তু বিষয়টি এত সহজ-সরল নয়। প্যাঁচ আছে নানা কিছিমের। তার মধ্যে, পহেলা বলা দরকার, সাম-এর বংশধররা একটা 'জাতি' ব'লে কবুল ক'রতে অনেকেই নারাজ। মহা বন্যার পর হজরৎ নূহ-(আ.)এর কিশ্‌তী কোথায় মাটি পেয়েছিল তা নিয়ে আজও গবেষণা চ'লছে। ভূ-বিদ্যাবিদ্‌রা বলেন—"সুমেরীয় যুগে মেসোপটেমিয়ায় মহাপ্লাবন হবার প্রমাণ পাওয়া গেলেও আরারাত পর্বতের চূড়ায় কিস্তি আটকে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ।" তবে, অনেকেই মনে করেন, এ-মহাবন্যা দুনিয়া জোড়া হয়নি; হ'য়েছিল শুধু মেসোপটেমীয় এলাকায়।

অথচ এই 'ক্ষীণ সম্ভাবনা'র ওপর নতুন আস্থার সৃষ্টি ক'রেছেন—একটি মার্কিন পর্বত-অভিযাত্রী দল। এদের মধ্যে দু'জন সদস্য মার্কিন

প্রত্নতত্ত্ববিদ্—ভেনডেল জোনস্ ও ডেভিড ফসোলড: হজরৎ নূহ-(আঃ)এর কিশ্‌তীর খবর দিয়ে তৌরাত, বাইবেল ও কোরআনের বিবরণের সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমন্বয় ঘটান। দীর্ঘকাল গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর—"তাঁরা কুরআন ও বাইবেল থেকে এবং একটি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থ থেকে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হন যে, তুরস্কের 'জুদী' পাহাড়-ই হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে মহাপ্লাবন শেষে কিশ্‌তীটি পরিত্যক্ত হ'য়েছিল। এ-ধারণাকে পুঁজি ক'রেই তাঁরা তাঁদের অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ শুরু করেন। কয়েক বছর আগে তাঁরা এর সমর্থনে তথ্য উপস্থাপনে সমর্থ হন। আসলে, যেটিকে তাঁরা একটি কিশ্‌তীর ধ্বংসাবশেষ ব'লে মনে ক'রছেন—তা সত্যি সত্যি-ই একটি কিশ্‌তী কিনা, আর তা কিশ্‌তী হ'য়ে থাকলে, তা সেই নূহ-(আঃ)এর কিশ্‌তী কি না—এ-নিয়ে প্রাথমিকভাবে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়।

তবে দুই প্রত্নবিজ্ঞানী এসব প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর দিয়েছেন। দুই বিজ্ঞানী যে-স্থানটিতে এ-কিশ্‌তীর ধ্বংসাবশেষ পান, তা হ'চ্ছে 'জুদী' পাহাড়ের সাত হাজার ফুট উচ্চতায়। কুরআন, বাইবেল ও তাওরাত—এই তিন ধর্মগ্রন্থেই এর উল্লেখ র'য়েছে। বাইবেলে (ওল্ড টেস্টামেন্ট)—এর দৈর্ঘ্য সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—এটি ৩শ' কিউবিট দীর্ঘ। প্রস্থ ৫০ কিউবিট। আর উচ্চতা ৩০ কিউবিট। এক কিউবিট প্রায় দেড় ফুটের সমান। সে হিসেবে বাইবেলে বর্ণিত নূহ-(আঃ) এর নৌকাটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে—৪৫০ফুট, প্রস্থ ৭৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪৫ ফুট। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' অনুযায়ী ঠিক এই রকমের নৌকা নির্মাণের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা হজরত নূহ-(আঃ)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নৌকাটির আকার-আকৃতি কি রকম হবে, তাও আল্লাহ-ই নির্দেশ ক'রেছিলেন। এটি ছিল গোদার কাঠের তৈরী। এর সঙ্গে ব্যবহৃত হ'য়েছে প্লাস্টার। একটি গ্রীক প্রাচীন গ্রন্থেও নূহ-(আঃ) এর কাহিনীতে ঠিক এই এক-ই মাপ ও ধরনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার নৌকার উল্লেখ র'য়েছে। আর সব চেয়ে মজার বিষয় হ'চ্ছে জুদী পাহাড়ের যে ভূ-খণ্ডে দুই প্রত্নবিজ্ঞানী এই নৌকার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন—তাঁরা তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সঙ্গে কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত উক্ত নৌকার মাপ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার মিলও পেয়েছেন।

মার্কিন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিঃ জোন্‌স বলেন, প্রত্ন-এলাকায় আমরা দীর্ঘ দিন অনুসন্ধান, খনন ও গবেষণা চালিয়ে যে-বিশাল আকৃতির নৌকার ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি—তা দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ফুট ও প্রস্থে ৭৫ ফুট। এ- ক্ষেত্রে তাঁরা

প্রমাণ হিসেবে সেই নৌকার ধ্বংসাবশেষের ছবি উপস্থাপন ক'রেছেন। পরে এ-ধ্বংসাবশেষের নমুনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়—নৌকাটি কতদিনের পুরানো তা নির্ণয়ে, এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হ'য়েছে। এ-নৌকাটির কাঠের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। সব-ই পঁচে ধুয়ে-মুছে গেছে। তবে, যে-প্লাস্টার সহযোগে নৌকাটি নির্মাণ করা হ'য়েছিল—তার অস্তিত্ব র'য়েছে এবং তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হ'য়েছে অক্সফোর্ডে।

নূহ-(আঃ) এর নৌকা নিয়ে ভেন্‌ডেল জোন্‌স দীর্ঘ দিন থেকে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে আসছিলেন। এক পর্যায়ে ১৯৮৮ সালে মার্কিন টিভি নেটওয়ার্ক পিবিএস তাঁকে তুরস্কের ওই প্রত্ন-এলাকা সফরের আমন্ত্রণ জানায়। কারণ, স্থানীয় তুর্কীদের ধারণা—ঐ এলাকাটি-ই হ'চ্ছে সম্ভাব্য সেই প্রত্ন-এলাকা, যেখানে নূহ-(আঃ) এর নৌকার অস্তিত্ব র'য়েছে। পিবিএস টিভি নেটওয়ার্কের এই আমন্ত্রণ পেয়ে মিঃ জোনস্ সেখানে ছুটে যান। মিঃ জোন্‌স বলেন, প্রথমে নৌকাটির প্রস্থ বিষয়ে তাঁদের সংশয় দেখা দিয়েছিল। কারণ পবিত্র গ্রন্থসমূহে নৌকাটির প্রস্থ বিষয়ে যে-মাপ র'য়েছে, প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ-এর প্রস্থ তার চেয়ে বেশি হবে বলে তাদের প্রাথমিক ধারণা হ'য়েছিল। ধারণা হয়—প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের প্রস্থ হবে ৭৫ কিউবিট। অর্থাৎ ১১২ দশমিক ৫ ফুট। অথচ পবিত্র গ্রন্থসমূহে এর প্রস্থের মাপ উল্লেখ করা হ'য়েছে ৫০ কিউবিট অর্থাৎ ৭৫ ফুট। তবে, পরবর্তীতে ফটোগ্রাফিক প্রমাণ থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আসলে ধ্বংসাবশেষে এর গড় প্রস্থ হ'চ্ছে ৫০ কিউবিট। উল্লেখ্য, প্রত্ন-এলাকায় এই নৌকাটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে অনেকটা চোখের আকৃতির। এদিকে, এক-ই সঙ্গে পুরানো জাহাজ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং নূহ-(আঃ) এর নৌকা অনুসন্ধান-দলের সদস্য ডেভিড ফসোলডও প্রায় দুই দশক ধ'রে এই নৌকা বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে আসছিলেন। ওয়াশিংটনের এক কফি বারে ভেন্‌ডেল জোন্‌স এবং ডেভিড ফসোলড-এর সাক্ষাৎ ও আলোচনা হ'য়েছিল। মিঃ জোন্‌স-এর কাছ থেকে ফসোলড এ-বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত পাবার পর, তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নৌকাটির প্রস্থ সম্পর্কে ধারণা এবং এ-বিষয়ে ফটোগ্রাফিক প্রমাণ ইত্যাদি কাজের দ্রুত ও ব্যাপক অগ্রগতি হয়। আর এসব তথ্য, উপাত্ত এবং প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তাঁরা নৌকাটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

তবে মিঃ জোন্‌স ও মিঃ ফসোলড এ-সংক্রান্ত আলোচনায় একটি রহস্যজনক গ্রীক গ্রন্থের নামও উল্লেখ ক'রেছেন—যেখানে নৌকাটির মাপ-জোকের বিষয়ে একটি রহস্যজনক সংখ্যা র'য়েছে। আর তা হ'চ্ছে '৫x ২'। আসলে সেই

প্রাচীন গ্রন্থে এই প্রতীক দ্বারা কি অর্থ বুঝানো হ'য়েছে—তা আজও অনুদ্‌ঘাটিত। জোন্‌স ব'লেছেন—তাঁরা নিজেরাই এ-সংখ্যার বিষয়ে অবাক হ'য়েছেন। আসলে পাঁচ গুণন দুই (৫X২) সংকেত দ্বারা কি বুঝানো হ'য়েছে—তাদের কাছে তা সত্যি-ই রহস্যপূর্ণ। তাঁরা এর অর্থ উদ্ধার ক'রতে পারেননি। তবে ওয়াশিংটনের কফিবারে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ফসোলড-এর এক সহকর্মী তাঁকে ব'লেছিলেন—গ্রীক সেই প্রতীক হ'তে পারে, ঘড়ির কোন মিনিট কিংবা কম্পাসের কোন ডিগ্রী প্রসঙ্গে কোন সাংকেতিক চিহ্ন।

প্রাচীন মানচিত্র অনুযায়ী নূহ-(আঃ)এর ঐ কিস্তির বিষয়ে একটি 'নেভিগেশনাল স্টেট্‌মেন্টে'রও একটি ধারণা ব্যক্ত করা হ'য়েছে। কিন্তু এই কিশ্‌তীর যাত্রা কোথায় শেষ ও কোথায় তা পরিত্যক্ত হ'য়েছিল— সে-বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটান ঐ দুই প্রত্নবিজ্ঞানী --- তাঁরা প্রমাণ ক'রেছেন— যে, নূহ-(আঃ)এর এই কিশ্‌তীর ধ্বংসাবশেষ র'য়েছে তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে আরারাত পর্বত শ্রেণীর জুদী পাহাড়ে।"

বৃটিশ ম্যাগাজিন "সানডে মেইল"-অবলম্বনে লিখিত ঐ বিষয়ে হাল নাগাদ খবর হ'ল—

"নূহ-(আঃ) এর কিস্তির সন্ধানে আগামী গ্রীষ্মে (২০০৪ সালের বর্তমান সময়ে) তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী যৌথ অভিযান চালানোর পরিকল্পনা ক'রেছেন। তুরস্কের আরারাত পর্বতের শীর্ষে—এই কিস্তি বরফের নীচে লুকিয়ে থাকতে পারে ব'লে অভিযাত্রীরা ধারণা ক'রছেন। তুর্কী সরকারের অনুমোদন পেলে ১০ জন অভিযাত্রী একটি দল ১৫ই জুলাই থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত তুরস্কের উচ্চতম পর্বতের শিখরে এই দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা ক'রবেন। পর্বতটির উচ্চতা ১৭ হাজার ৮২০ ফুট। গত বছর গ্রীষ্মে ইউরোপে দাবদাহের সময় বরফ গ'লে ৪৫ ফুট উঁচু ও ৭০ ফুট প্রশস্ত এবং ৪৫০ ফুট দীর্ঘ একটি বিরাট নৌকার মত অবকাঠামো প্রকাশিত হয়। এর কাছে যাওয়াই হ'ল এই অভিযানের লক্ষ্য। হাওয়াই-এর 'শ্যামরক দি ট্রিনিটি কর্পোরেশন অব্ হনলুলু'-এর সভাপতি ডেনিয়েল পি ম্যাকগিডেন বলেন,—"আমরা কিস্তির জন্য খনন কাজ চালাবো না। আমরা কোনো নিদর্শন সংগ্রহ করার চেষ্টা ক'রব না। আমরা শুধু এর ছবি ধারণ ক'রতে চাই। খোদা চাইলে আপনাদের সকলেই তা দেখার সুযোগ পাবেন। তিনি কিস্তিটির সন্ধান পাবার ব্যাপারে আশাবাদী। অভিযাত্রীরা দীর্ঘদিন ধ'রে আরারাত পর্বতের উচ্চ ঢালে নূহ-(আঃ) এর কিস্তির সন্ধান চালিয়েছেন। পবিত্র বাইবেলে এই স্থানে নূহ নবীর মহাপ্লাবনের প্রসঙ্গের উল্লেখ র'য়েছে। ১৯৫৭ সালে তুর্কী

বিমানবাহিনীর পাইলটরা কিস্তির সদৃশ বস্তু দেখতে পান এগ্রী প্রদেশে । সরকারও অবশ্য স্থানটি দেখার বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তবে আরারাত পর্বতসহ সমগ্র এগ্রী প্রদেশে বিদেশীদের যাতায়াতের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এর কারণ হ'ল—সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিযোগ। মস্কো বলে যে, পর্বতারোহীরা মূলতঃ ছদ্মবেশী মার্কিন গুপ্তচর।

১৯৮১ সালে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। আরারাত পর্বতের কাছের অধিবাসী তুর্কী পর্বতারোহী আরছালান এ-অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন। তিনি বলেন, উপগ্রহ-চিত্রের সাহায্য থেকে কিস্তির স্থানটি নিখুঁতভাবে নিরূপণ করার কারণে তা খুঁজে পাওয়া এখন সহজ হবে। বাইবেলে নূহ নবীর প্লাবন সম্পর্কে বলা হ'য়েছে, মহাপ্লাবনের পর তার কিস্তি আরারাত পর্বতে এসে ভীড়ে। এ-কিস্তিতে নবীর পরিবার-পরিজন এবং প্রতিটি প্রাণী জোড়ায় জোড়ায় ছিল।"

পত্র-পত্রিকার এ-খবর ছাড়াও বলা দরকার, আলোচ্য বিষয়টি শুধু পত্র-পত্রিকার পাতায় নয়, নৃবিজ্ঞানীদের গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে।

এ-বিষয়ে, বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ব্লুমেনবাখ ব'লেছেন—'হজরৎ নূহ-(আঃ) এর নৌকা মহা বন্যার পর ককেশীয় পর্বতমালার কোন এক স্থানে মাটি পায়। আর এ-এলাকাতেই নূহ-(আ) এর তিন পুত্র সাম (Shem), হাম (Ham) ও জফেথ (Japheth)—নৌকো থেকে নেমে মাটিতে 'পা রাখেন', তথা বসবাস করা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর ঐ মতের তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছেন—মর্টন ক্লাস ও হল হেলম্যান। তাঁরা ব'লেছেন—"It would seem unlikely that a scholar as learned as Blumenbach would make such a mistake , for Mount Ararat is actually located in what is presently the eastern part of Turkey".(P.31)

নৃবিজ্ঞানীদ্বয় মূল বিষয়ের সমালোচনায় লিখেছেন—"While scholars today rarely seek to find out who are the sons of Shem and who the sons of Ham, the words *Semitic* and *Hamitic* are still very much in use. (*Japhite*, however, appears to have gone out of use.) Whether the words *Semite* and *Hemite* can properly be used to classify human groups (or "races") is currently the subject of argument; but those who study languages agree there is a Semitic family of languages (Hebrew, Arabic, and a number of others) and some scholars also believe there is a *Hamitic* Family as well

(Ancient Egyptian and other languages in Africa) (P.16)"

অতএব, আধুনিক ইউরো-আমেরিকান নৃবিজ্ঞানীরা সাম,. হামদের আলাদা আলাদা জনকওম ও ভাষার ভিত্তিতে জাতি-নির্বাচন এবং ভাষা-নির্ধারণে **আগ্রহ হারিয়ে ফেললেও;** 'আর্য্য জাতি ও ভাষা'র মতই তাঁরা এখন— 'সেমিটিক ভাষা আছে; জাতি নেই'—ব'লেও কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু আগেই বলা হ'য়েছে—ভাষা কখনও জনকওম-নিরপেক্ষ হ'তে পারে না। কোন বিশেষ ভাষা থাকলে; সেই ভাষা-ভাষী জনকওম বা 'জাতি'ও থাকতেই হবে।

এ-সূত্র অনুযায়ী এবার সেমিটিক-হেমিটিক জাতি ও ভাষার মূল কোথায়—তা দেখা দরকার।

খ) 'সেমিটিক' ভূমি কোথায়?

উপরের আলোচনা থেকে জানা যায়, হজরৎ নূহ-(আঃ)এর সন্তানদের থেকে সেমিটিক-হেমিটিক ভাষার পয়দা। তা হ'লে, বন্যার আগে-পরে তাঁদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল—তা জানা দরকার। একথা ঠিক যে, হজরৎ নূহ-(আঃ)এর কিশ্‌তী পূর্ব তুর্কিস্তানের আরমেনিয়ায় অবস্থিত আরারাত পর্বত মালার সর্বোচ্চ "জুদি" পাহাড়েই হোক, অথবা আরব দেশের 'জুদি'-পর্বত শিখরেই হোক; হজরৎ নূহ (আঃ) ও তাঁর তিন পুত্রসহ মোট চল্লিশ জন লোকের সবাই যে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী ছিলেন—তা কারো পক্ষে না-কবুল করা চলে না। তাহ'লে, এসব লোক (শেম-হেমসহ) মহাবন্যার যতদিন পরে, যেখানেই কিশ্‌তী থেকে নেমে বসতি গ'ড়ে তুলুন না কেন; তাঁরা মহাবন্যার পূর্বে মেসোপটেমিয়ায় বাসকালে যে-ভাষায় কথা বলতেন; তা নিশ্চয় হারিয়ে ফেলেননি। তাঁরা এক-ই নবী হজরৎ নূহ-(আঃ)এর সন্তান, আত্মীয় ও উম্মত, এক-ই রকম ইমানদার ও এক-ই ভাষায় কথা ব'লতেন ব'লে—ঐ ভাষাটি-ই যে সাম ও হাম এবং তাঁদের সাথীদেরও ভাষা ছিল—তা মানতেই হবে।

এখন দেখা যাক, হজরৎ নূহ-(আঃ) এর নিজের ভাষাই তাঁর জাতির ভাষা তথা মেসোপটেমিয়ার আদি ভাষা ছিল কি না এবং তার নাম কি ছিল।

গ) মেসোপটেমীয় ভাষার নাম

সবাই জানেন, হজরৎ নূহ-(আঃ) এর জন্মভূমি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বা বর্তমান ইরাক। আল্ কোরআনে তাঁকে একজন রছুল বলা হ'য়েছে। আর নবী-

রছুলরা হ'লেন—আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসা, বিশেষ বিশেষ জাতির জন্য হেদায়েৎকারী। এক এক দেশের এক এক জন-কওমের জন্য আল্লাহ এক এক সময়, এক এক জন নবী বা রছুল পাঠিয়েছেন। আর এ-বিষয়ে আল্লাহ ব'লেছেন—'আমি প্রত্যেক রছুলকে তাঁর স্বজাতির ভাষা-ভাষী ক'রে পাঠিয়েছি।' (ছুরা-ইব্‌রাহীম, আয়াত-৪)। এছাড়া, সুরা হাদিদ্-এ ছাফ বলা হ'য়েছে—"আমি নূহ ও ইব্‌রাহীমকে রছুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম (আয়াত-১৬)। আল্ কোরআনের ছুরা আন্‌কাবুত থেকে আরও জানা যায়—মহা বন্যার সৃষ্টি হয়—হজরৎ নূহ-(আঃ) এর জন্মের ৯৫০ বছর পরে। তার অর্থ—ঐ বন্যার এক হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় যে-জাতি বসবাস ক'রত; সে-জাতি ছিল হজরৎ নূহ-(আঃ) এর জাতি। ঐ জাতির হেদায়েতের জন্যই তিনি প্রেরিত হ'য়েছিলেন। তাহ'লে, ঐ-জাতির উৎপত্তি আরও অনেক আগে। আলোচ্য জাতি যে, এক ভূমিক এবং এক স্থান-কেন্দ্রিক জাতি ছিল—তা কবুল না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এ-জাতির ভাষা-নাম কি ছিল, তা জানা যায় না। দেশ-নাম মেসোপটেমিয়াই বা কত পুরানো—তাও বলা মুশ্‌কিল। হজরৎ নূহ-(আঃ)এর পুত্র-পরিবার ও অনুসারী যে-চল্লিশ জন লোক মহা বন্যা থেকে রেহাই পেয়ে পরবর্তী কালে দুনিয়ায় বংশ-বিস্তার করেন এবং কোরআনের ভাষায় তাঁদের থেকে "বহু জাতি" সৃষ্টি হয়; সে-সব জাতির নাম-তালিকাও পাওয়া যায় না। এ-কারণে, শুধু এটুকু বলা যায় যে, মহাবন্যার পূর্ববর্তী হাজার-দু'হাজার বছরের মেসোপটেমীয় এলাকার ভাষা আর তথাকথিত সেমিটিক বা সামী ভাষা এক-ই। তবে সেই মূল ভাষাকে—'সেমিটিক' বা 'সামী ভাষা' বলা চলে না।

কারণ, সাম-হামের জন্মের পূর্বেকার নূহ-(আঃ) ও তাঁর পূর্ব পুরুষদের ভাষার নাম সাম-হামের নামে হ'তে পারে না। ঐ নাম একালে রাখা হ'য়েছে। তাই মহাবন্যা-পূর্ববর্তী মেসোপটেমিয়ার হাজার-দু'হাজার বছরের ভাষা-নাম খুঁজে পেতে হ'লে, ঐ এলাকার আদি জনবসতির ইতিহাস খুঁজতে হবে। দেখতে হবে—তাঁরা মেসোপটেমিয়ার মূল অধিবাসী ছিল; না অন্য কোন দেশ থেকে অন্য কোন নাম নিয়ে এসেছিল। তাঁরা যদি বিদেশের কোন এলাকা থেকে এসে থাকে; তাহ'লে, তাদের সেই এলাকার নামেই যে, ভাষা নাম হ'বে—তা সবাই মেনে নিতে বাধ্য।

ঘ) মেসোপটেমিয়ার আদি জনবসতি

এ-এলাকার আদি জনবসতির ইতিহাস পাওয়া কঠিন। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ক্রোয়বার-এর লেখা থেকে জানা যায়—সিরিয়া, উত্তর মেসোপটেমিয়া, ইরান,

এমনকি তুর্কিস্তানের দক্ষিণ পাশ—নব্য প্রস্তর যুগীয় কৃষি-ভূমি। তখন এখানে-সেখানে, তাঁর ভাষায়—'তামার ব্যবহার শুরু হ'য়েছিল। সময়টা খৃ. জন্মের ৫ হাজার বছর আগের'। তখন—"..... Sumer was still uninhabited. In the fourth millennium, they were more or less abreast; only with the last predynastic, about 3200B.C., did Sumer emerge into leadership. Gawra, in the subsequent Assyria had then been settled perhaps two thousand years. To the east of Sumer, Susa, main twon of the people of Elam—another separate people whose speech affiliations are unknown—has an occupation record going back as far as anything in Sumer..........

On the Iranian plateau Sialk and other sites are now known to contain about as long a record back into the Neolithic as any Near Eastern area. But we do not know the affinities of the people who left these upland sites. We do not know what language they spoke. It was most likely something other than Indo-European, to which the Iranian dialects of the historical period belong "...... (P.712)

অতএব, সেই প্রাচীন জনকওমের ভাষার সাথে যে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বা জনকওমের কোন রিশ্‌তা (আত্মীয়তা) ছিল না—তা ঠিক।

তারপর ক্রোয়বার লিখেছেন—'খৃ.পূ. এক হাজার অব্দের আগে ও পরে দজলা-ফোরাতের উর্বর চন্দ্রভূমিতে Fertile Crescent) আসে এবং আরও আসে ইরান থেকে বর্তমান ইরাকী কুর্দীদের পূর্বপুরুষেরা। তারা সবাই ছিল পাহাড়ী মানুষ। তাদের—"....Movements failed to penetrate the center as profoundly as did Semitic inflows. Nor was the Indo-Europeanization of the occupied territories as permanent as the Semitization" (P. 714)

নৃবিজ্ঞানী ক্রোয়বার এই তথাকথিত সেমিটিক অভিযানকারীদের আগমন সম্পর্কে আরও লিখেছেন—"The Semitic invasions seem to have proceeded largely **from the great motherland of that stock, Arabia, from whose deserts and half-deserts peoples have repeatedly swarmed out.** Some of the

movements were outright conquests, others half-forceful penetrations, still others infiltrations. **Several great waves can be distinguished.** by 2600 B.C. there was a drift which brought the Akkadians, the people of the emperors Sargon and Naram-sin, into the Mesopotamian valley north of Sumer, into the part that was later to become Babylonia. Perhaps the Assyrians moved about the same time into their future home up the Tigris, the Canaanites and the Phoenicians into the Syrian region. After 2000 the Amorites flowed north: also into Akkad, where Babylon was now founded and so named and where their famous lawgiver Hammurabi ruled; and elsewhere into Mesopotamia and into Syria. Around 1400 and after, the Aramaeans gradually occupied the Syrian district, with Damascus, "Aram", as their center; and the Hebrews began to dispossess the Canaanites. From about 800 B.C. on another seep brought the Chaldaeans into Babylonia and into old Sumer—whence the Biblical anachronism of "ur of the Chaldees". They were ultimately to erect one more imposing Semitic realm, the briefly resurrected Neo-Babylonia of Nebuchadnezzar. **Then, for more than a thousand years, Arabia lay contained within itself,** dammed perhaps by the Persian, Macedonian, Parthian, and Roman empires, until, in the Seventh Century after Christ, **Mohammedanism led forth its peoples.** A much earlier movement, at an unknown time, had brought the forefathers of the Abyssinians into Africa, probably across the mouth of the Red Sea." (P.714).

ক্রোয়াবারের এই বয়ান থেকে খুব-ই পষ্ট যে, আদি তথাকথিত 'সেমিটিক' জনস্রোত এসেছিল,—তাদের মূল জন্মভূমি আরব থেকে। আর তারা একবার নয়; কয়েকবার এসেছিল—ঢেউয়ের মত জনস্রোত-আকারে। কাজেই আদিতে আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, এশীরীয়, কেনানীয়, ফিনিশীয়, মেসোপটেমীয় ও সিরীয়রা,

যেখানেই আদি বসতি গ'ড়ে তুলুক না কেন, তারা এসেছিল আরব ভূমি থেকেই। পরবর্তীকালে, আরামীয়রা তাদের এক জনকওমকে সিরিয়া থেকে এবং হিব্রুরা(ইহুদীরা) অপর এক জনকওমকে কেনান থেকে বেদখল ক'রে দেয়। পরবর্তীতে ক্যালডীয়রা এসে ব্যাবিলনীয়া দখল ক'রে নেয়। দখল করে পুরানো সুমের। এরাও ঐ সব এলাকার জনবসতির ওপর, ভাষার ওপর—তাঁদের মূল জনধারা ও ভাষার আরেকটি উপরিস্তর তৈরী করে। এরপর প্রায় এক হাজার বছর তাদের মূলভূমির মূল জনকওমের (আরবদের) ঘুমোবার কাল। এ-ঘুম থেকে তাঁরা জেগে ওঠে তাঁদের লিপি, ভাষা, ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার নতুন রূপ ও শক্তি নিয়ে—ইছলামের তরবারি হাতে। অজ্ঞাতপূর্ব কালের আদি আরবীয় জনস্রোতের পূর্ব পুরুষরাই যে, আবিসিনিয়ায় জনবসতির পত্তন করে—ক্রোয়রার সে-বিষয়েও নিশ্চিত।

অতএব, আরবীয় জনস্রোত বা জনসত্ত্বাই যে, মেসোপটেমীয় জনসত্ত্বার মূল তা ঠিক। এ-বিষয়ে কেবল ক্রোয়বার নন, আরও অনেক ইউরোপীয় ও এশীয় বিদ্বান—আলোচনা ক'রেছেন।

আলোচ্য বিষয়ে অল্পকাল আগে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের + বিভাগের প্রফেসর জনাব আ. ত. ম. মোসলেহ উদ্দীন। "সামী ও আরবী ভাষা" নামক তাঁর এ-গবেষণামূলক নিবন্ধে তিনি প্রাথমিক আলোচনার পর লিখেছেন—"সামীদের আদি বাসস্থান ছিল আরব দেশ। এ-মতবাদ বর্তমানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত মতবাদের মর্যাদা অর্জন ক'রেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত এ-মতবাদের জোরালো সমর্থক। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমরা নিম্নে উল্লেখ ক'রছি ঃ সাইস (Sayce) তাঁর রচিত 'এ্যাসিরিয়ান গ্রামারে' (১৮৭২), স্পিরেঙ্গার তাঁর 'আরব দেশের ভূগোল' সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে (১৮৭৫), শ্রোডার (Schrader) তাঁর এক প্রবন্ধে (১৮৭৩) এবং ডি গোই (De Goeje) তাঁর এক অভিভাষণে (১৮৮২)—আরবীয় মতবাদের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন ক'রেছেন। এতদ্ব্যতীত ভিংকলার (Winkler), টেৈল (Tiele), মায়ার (Meyer), কীন (Keane), রবার্টসন স্মীথ, উইলিয়াম রাইট (W. Wright) রজার্স প্রমুখ ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতও উক্ত মতবাদের সমর্থক। নলডিকের মত প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ও মতবাদটির যৌক্তিকতা অস্বীকার করেননি। এ- মতবাদের যুক্তিগুলো আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রছি; (১) ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আরবদেশ থেকে সামীরা হিজরত ক'রে অন্যান্য দেশে গমন ক'রেছে; (২) **সকল সামী ভাষার মধ্যে আরবী ভাষাই মূল সামী ভাষার নিকটতম ভাষা;** (৩)

আরবদের দৈহিক গঠন, তাদের খাঁটি সামী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ক'রেছে, এবং (৪) তাদের সামাজিক জীবন—সামী জীবন-পদ্ধতির স্মৃতি বহন ক'রছে।

এখন আমরা এ-বিষয়ে বিশিষ্ট কয়েকজন মনীষীর চিন্তাধারার সংক্ষিপ্তসার বিবৃত ক'রতে চেষ্টা ক'রব। আমেরিকান প্রাচ্যবিদ্ সাইস (এ্যাসিরিয়ান গ্রামারে) লিখেছেন সামী উপাখ্যানগুলি সবদিক দিয়ে এ-বিষয়ে ইঙ্গিত ক'রছে যে, আরব দেশ-ই সামীদের মূল বাসস্থান। সারা পৃথিবীতে এই একটি অঞ্চল-ই খাঁটি সামী দেশ ব'লে পরিচিত। বংশগত বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাসের গভীরতা, হিংস্রতা, বহির্বিশ্ব থেকে আলাদা থাকার প্রবণতা, বেদুইন জীবনের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি বিষয়, মরুভূমির সঙ্গে তাদের মৌলিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ ক'রছে। ডক্টর স্প্রিঙ্গার বলেন—"আমার বিশ্বাস হ'ল—সকল সামী জাতি পর্যায়ক্রমে আরবদেশের অধিবাসী ছিল অর্থাৎ কিছু অন্যত্র প্রস্থান ক'রলেও একদল তথায় র'য়েই গিয়েছে। আর তাদের পালাক্রমে দেশ-ত্যাগের এ-রীতি দীর্ঘকাল ধ'রে অব্যাহত ছিল। আমরা ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে কনানীদের দেশ-ত্যাগ ক'রতে দেখি। তাদের পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরও কত দল এভাবে দেশ ত্যাগ ক'রেছে তা কে ব'লতে পারে? শ্রোডার এক জার্মান পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে মত প্রকাশ ক'রেছেন যে, ধর্মীয় ঐতিহ্য, শব্দ-বিষয়ক গবেষণা এবং ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা—বিভিন্ন সামী জাতির আদি বাসস্থান আরব দেশে হওয়াই প্রমাণ করে। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ ডি গোই একটি একাডেমিক অধিবেশনে (১৮৮২) সভাপতির ভাষণ দানকালে মন্তব্য করেন—"মধ্য আরব-ই সামীদের আদি বাসস্থান। যেখান থেকে বিভিন্ন দল সিরিয়া, বাবিল, উমান এবং ইয়েমন ইত্যাদি দেশে চ'লে যায় এবং তারা এদেশের মূল বাসিন্দাদেরকে তথা থেকে অন্যত্র বিতাড়ন করে।" আমেরিকান প্রফেসর রজার্স তাঁর 'ব্যাবিলন ও এ্যাসিরিয়্যার ইতিহাসে' লিখেছেন যে,—সামী জাতিদের প্রথম বাসস্থান আরব দেশ ছিল। এটি এখন একটি স্বীকৃত মতবাদ। 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র 'সেমাইট ও সেমিটিক' প্রবন্ধের রচয়িতা প্রাচ্যবিদ্ নলডিকে, প্রবন্ধটিতে সামীদের বাসস্থানের উপর আলোচনান্তে মন্তব্য ক'রেছেন যে, 'আরবীয় মতবাদ কোন অর্থেই অযৌক্তিক নয়'। উক্ত এনসাইক্লোপিডিয়ার 'আরব'-শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বলা হ'য়েছে; বেশ কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের মতে আরব-ই সামীদের আদি বাসস্থান। যদিও বিষয়টি এখনও পুরোপুরি সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু ভাষা-সংক্রান্ত গবেষণা, পৌরাণিক নিদর্শন ইত্যাদি দ্বারা বোঝা যায়, আরবীয় মতবাদটি সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আরবদেশ সামীদের বাসস্থান হওয়া সম্পর্কে তওরাতের বর্ণনার ব্যাখ্যা

পূর্বেই করা হ'য়েছে। ইউসিকোসে, (ইহুদীদের ইতিহাস-গ্রন্থ) যেটি এক অর্থে তওরাতের-ই টীকা, এ-বিষয়ে মন্তব্য করা হ'য়েছে যে, তারা (সামীরা) ফুরাত নদী থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত অঞ্চলে বাস ক'রত। ফুরাত নদী ও ভারত মহাসাগরের মধ্যখানে আরব ছাড়া আর কোন্ দেশ আছে?

এ-বিতর্কের মীমাংসা ক'রতে হ'লে আরও একটি বিষয় অনুধাবন ক'রতে হবে। আরবরা ব্যতীত অন্য কোন জাতি তাদের দেশ, সামীদের প্রথম বাসস্থান ব'লে আজ পর্যন্ত দাবী করেনি। আরবরাই সাধারণতঃ তাদের দেশকে সামীদের বাসস্থান ব'লে দাবী ক'রে আসছে। বহু সাক্ষ্য ও যুক্তি তাদের স্বপক্ষে র'য়েছে। অন্য কোন দাবীদারও যখন নেই, তখন তাদের দাবী-ই সত্য ব'লে মেনে নেওয়া ন্যায়সঙ্গত। বহু আরব ঐতিহাসিক বিষয়টি বিস্তারিত লিখেছেন। ইবনুল কুতায়বা (২৭৬/৮৮৯) লিখেছেন—'নূহের সন্তান' সামের বংশধর—মধ্য আরব অর্থাৎ মক্কার আশেপাশে, য়মন থেকে হাদ্রামওত, ওমান—বাহ্রাইন ইত্যাদি এলাকায় বাস ক'রত। তদ্রূপ মতামত ইয়াকুবী ও (২৮০/৮৯৩) ব্যক্ত ক'রেছেন। সর্বোপরি পবিত্র কুরআন হ'তেও একটি প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। কুরআন মক্কাকে "উম্মুল কুরা" ব'লেছে অর্থাৎ সকল দেশের উৎস এই মক্কা। তাহ'লে প্রথমে মক্কাতেই মানুষের বসতি স্থাপিত হ'য়েছিল ব'লে প্রতীয়মান হয় না কি?"

অবশ্যই তা "প্রতীয়মান" হয়। আর তা কেবল ভাষা ও জনস্রোতের বিচারে নয়; লিপি-বিচার ক'রলেও এক-ই মন্জিলে পৌঁছনো যায়। তার উল্লেখ আগেই করা হ'য়েছে।

জনাব মোসলেহ উদ্দীন এ-বিষয়ে বিস্তর আলোচনা ক'রেছেন।* তাঁর আলোচনা আধুনিক নৃবৈজ্ঞানিক আলোচনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, তিনি 'ইন্দো-ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পীচ'-এর অন্তঃসারশূন্যতা এবং এক-ই ভাবে 'ইন্দো-সেমিটিক ভাষা-পরিবারে'র স্বতন্ত্রতা অনুধাবনের বিষয়টি চিন্তা করেননি। সেজন্য যাঁরা হাল আমলে 'সেমিটিক ভাষা আছে; জাতি নেই'—ব'লেন; তাঁদের বক্তব্যের ফাঁক তাঁর নজরে আসেনি। তাছাড়া, ইকোহরণ থেকে শুরু ক'রে আজ তক যাঁরা 'সামী' জনমানুষ ও ভাষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ক'রেছেন; তাঁরা হজরৎ নূহ-(আঃ) এর পূর্ববর্তী কালের জনমানুষ ও তাদের ভাষার সাথে পরবর্তীকালের জনমানুষ ও তাদের ভাষার যোগাযোগের কথা ভাবেননি। ফলে, যে-চল্লিশজন (মতান্তরে আশি জন) লোক মহাবন্যার পূর্ববর্তী কালের সাথে

*তিনি নিজে এই ভাষাকওমের যে-চার্ট তৈরী ক'রেছেন-সেটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

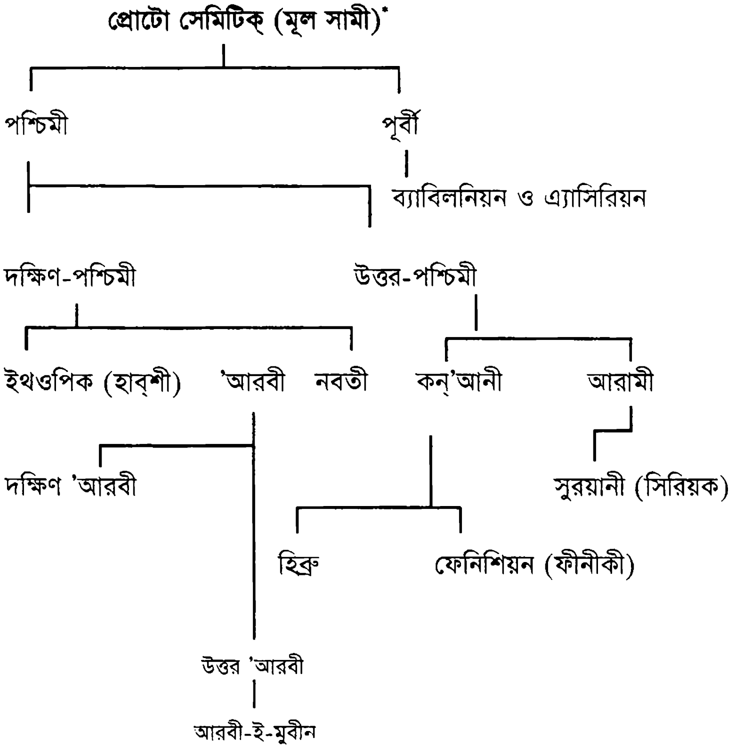

* চার্টটি তৈরী ক'রেছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক জনাব আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন। তিনি তাঁর বইয়ের ২৫০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাদটীকায় জানিয়েছেন—"ছকটি আমার নিজের তৈরি, তবে এটি তৈরি ক'রতে নিম্নলিখিত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ ক'রেছি: (১) এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা, ১৪শ সংস্করণ, সেমাইটস, (২) আরদুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯-৩০, (৩) রাইট, পৃ. ১২-১৫ (৪) প্রফেসর জে, ডাব্লিউ ফুয়েক, পিএইচ, ডি. (ফ্রাঙ্কফোর্ট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিয়াত বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯২৯-৩৫, কর্তৃক প্রদত্ত ক্লাস নোট, জনাব আবদুল হালীমের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ওলিঅরীর মতে কোন নির্দিষ্ট ছকে ভাষাগুলির বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নয়, কাজেই এ ছকটি ভূগোল ভিত্তিক; দেখুন ওলিঅরী, পৃ. ২-৪।"

পরবর্তীকালের জনধারা ও ভাষার যোগ রক্ষা ক'রেছেন— তাঁদের সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হ'য়েছে।

অতএব, মেসোপটেমিয়ার আদি জনবসতি যে, আরব থেকে আগত জনকওম কর্তৃক গ'ড়ে ওঠে এবং তাঁরা মেসোপটেমিয়ার ফোরাত নদীর অববাহিকায় প্রথম কৃষিজ-সভ্যতার পত্তন ঘটায়; এটাই সত্য।

৬) আদি মেসোপটেমীয়দের ভাষা-নাম

এবার আদি মেসোপটেমীয় জনকওম কি ভাষায় কথা ব'লত; তাঁদের ভাষার নাম বা লিপির নাম কি ছিল; কি-ই বা ছিল, দেশের নাম—তা জানার জরুরৎ আছে। একথা সত্য ইরাকের পূর্ব নাম—মেসোপটেমিয়া। এ-নাম প্রাচীন। কিন্তু ঐ নামের পূর্বেও কোন নাম থাকতে পারে—তা না-কবুল করা যায় না। এক-ই ভাবে, এ-কথাও মানা দরকার যে, আদি আরবীয় জনস্রোত যখন ফোরাতের কূলে এসে বাস করা শুরু করে, তখন হয়তো ঐ এলাকার কোন নাম-ই ছিল না। 'ফোরাত' নামটিও নয়। একটি এলাকার 'পানি ও মাটির বিভাজনকারী'দের ভাষা দিয়েই সেই এলাকার নদ-নদী, গাঁ-গেরাম-লোকবসতির নাম হয়। মেসোপটেমিয়ার পূর্বনাম জানা না গেলেও দজলা-ফোরাত—এই আরবী নাম দুটো যে, অতি পুরানো তা না মেনে উপায় নেই। শব্দ-দু'টো আরবী। কাজেই সেই অতি পুরানো কালের আরবাগত জনমানুষেরা যে, তাঁদের মূল জন্মভূমি আরবের ভাষাতেই কথা ব'লত, তা যুক্তি-সম্মত। কিন্তু সেই ভাষা কি 'আরবী'?

আজকের দিনে এক কথায় এর জবাব দ্রুত দেয়া যায় না। কারণ জনাব মোসলেহ উদ্দীন লিখেছেন—"সর্ব কনিষ্ঠ সামী ভাষা আরবী। কনিষ্ঠ এই হিসেবে যে, এ-ভাষায় ৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের কোন সাহিত্যের নিদর্শন মেলেনি। আরবী আরব দেশের ভাষা। এদেশের নাম আরব কেন হ'য়েছে? ভৌগোলিকদের মতে 'আরবহ্'......শব্দের সংক্ষেপ হ'ল 'আরব'।---সব সামী ভাষায় 'আরব'-অর্থ 'মরুভূমি' বা 'অনাবাদী জমি'। কুরআনে হজরৎ ইছমাইল-(আঃ) এর বাসস্থানের বর্ণনায় মক্কাকে -------ফসলবিহীন একটি উপত্যকা বলা হ'য়েছে। মরুময় অঞ্চল ব'লে,—এদেশ 'আরব'। ইয়েমন থেকে শাম (সিরিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল—'আরব' দেশ।"

জনাব মোছলেহ উদ্দীন লিখেছেন—"আরবী ভাষা নবীন বলার কারণ ৫০০ খৃ. অব্দের আগেকার কোন আরবী রচনার নজীর মেলে না"। অন্যপক্ষে, লেখক

নিজেই তাঁর এ-নিবন্ধের অন্য স্থানে উইলিয়ম রাইটের মন্তব্য কোট্ ক'রে জানিয়েছেন—"বর্তমান কালের আরবী দু'হাজার বছর পূর্বের আরবীর এক অতি ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধি..... ।"

তাহ'লে আরবী ভাষা যে, দু হাজার বছরেরও বেশী পুরানো, তা কবুল না-ক'রে উপায় নেই। এই সূত্রে যদি মেনে নেওয়া হয় যে,—"সকল সামী ভাষার মধ্যে আরবী ভাষাই মূল সামী ভাষার নিকটতম ভাষা।" তাহ'লে কি এ-কথা কবুল করা হয় না যে, আধুনিককালে যে-ভাষাকে সামী ভাষা (Proto-Semitic-অর্থে) বলা হ'চ্ছে—তা নিশ্চিত রূপে "আরবী" বলার কোন উপায় নেই। তবু তাকে 'আরবী' ভিন্ন অন্য নাম-পরিচয়ে উল্লেখ করার উপায়-ই বা কি? তাই তাকে আধুনিক পরিভাষায় 'আরবী' (আরব দেশের, আরবীয় জনকওমের ভাষা-নামে) ব'লেই পরিচয় দেয়া উচিত বই কি ?

বাঙ্লাদেশের প্রসঙ্গ তুলে বিষয়টি আরও পষ্ট করা যায়। কারণ, আমাদের দেশ-নামের অনেক বার বদল হ'য়েছে। জ্ঞাতকাল থেকে অজ্ঞাত কালের দিকে এ-বদলের পর্যায়গুলো নজর ক'রলে দেখা যায়—আজ যে-দেশের নাম বাঙ্লাদেশ—তা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে ছিল—"পাকিস্তান" (পূর্ব পাকিস্তান)। সেই পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের আগে ছিল "বেঙ্গল" বা 'বাঙ্গালা'। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুনের পূর্বে তার-ই নাম ছিল 'বাঙ্গালা' (বাঙ্গালাহ্)। এই বাঙ্গালার ১৩৫১খৃ. অব্দের পূর্বে—নাম ছিল 'গৌড়'। আর গৌড়ের প্রাচীন নাম ছিল—'বঙ্গ' । কিন্তু সে-নামের শুরু কবে, আর তার আগেই বা কি নাম ছিল; তা কেউ ব'লতে পারে না।

এক-ই ভাবে দেশ-নামের মত ভাষা-নামের স্রোত উজালে, ব'লতে হবে—(খুব ক্রিটিক্যাল না হ'য়ে) 'বাঙালা" আমাদের ভাষা-নামও । কিন্তু ১৩৫১ খৃ. অব্দের আগে এ-ভাষার যে, কোন্ নাম ছিল, তা কেউ নিশ্চয়তা দিয়ে ব'লতে পারে না। দীনেশচন্দ্র সেন সে-সময়ের 'বাঙালা'র নানা এলাকার ভাষাকে "গৌড়ীয় ভাষাসমূহ" ব'লেছেন। এ-নাম কোন একক ভাষা-নাম নয়। গৌড়ীয় নামটিও আধুনিক কালে দেয়া স্থানবাচক ভাষা-নাম। তাহ'লে গৌড়-পূর্ববর্তী পাঁচ শ' বা হাজার বছর আগেকার "বঙ্গ" দেশের ভাষার নাম কি ছিল? "বঙ্গ দেশীয়" বা "বঙ্গ দেশী ভাষা" কি? না বাঙ্গালা/বাঙালা/বাংলা ভাষা? যে -নামের কথাই বলা হোক না কেন; সে-নাম এখনকার দেয়া বই তখনকার নয়। কেননা-এ-সব নাম দু' আড়াই হাজার বছর আগেকার কোন বইপত্রে, শিলালিপিতে পাওয়া যাবে না। আর

'ল্যাংগুয়েজ' অর্থে "ভাষা" শব্দটাই তখনও তৈরী হয়নি। তা তৈরী হ'য়েছে—বৃটিশ আমলে।

এ-অবস্থায়, আজকে, আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন এ-দেশের অজ্ঞাত জনকওমের ভাষার নাম-পরিচয় যদি বাঙালার বাঙালীদের বাঙালা ভাষা বলা হয়,—যা বলা হ'য়েও থাকে; তা কি ভুল নয়? আবার, তা না-ব'লেই বা অন্য কি বলা যেতে পারে? তাহ'লে, পাঁচ হাজার বছরের পুরানো আরব দেশের আরববাসীর আরবী ভাষার অজ্ঞাত কালের অজ্ঞাত ভাষা-রূপের সেকালে কোন নাম যদি নাও থেকে থাকে; তবে আজ আলোচনার সুবিধের তরফে, তাকে মূল স্থান-নামে "আরবী"-ভাষা ছাড়া আর কি বলা চলে? বড় জোর প্রোটো-অ্যারাবিক? পাঁচ বা দশ হাজার বছর আগেকার এই অজ্ঞা নামের অপরিচিত ভাষা-রূপকে একালের কোলে দাঁড়িয়ে তাই 'আরবী' নামেই ডাকা উচিত।—যা সেমিটিক বা প্রোটো-সেমিটিক নাম থেকে অনেক বেশী যুক্তি-সম্মত। এর ফলে, সেমিটিক ভাষা আছে-জাতি নেই'—এই হাস্যকর তত্ত্ববিলাসের অস্তিত্ব যেমন লোপ পাবে; তেমনি ভাষা-বিচারও, সঠিক চেতনা খুঁজে পাবে। তাছাড়া, জোর ক'রে 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা'র সাথে 'ইন্দো-সেমিটিক ভাষা'র কাল্পনিক জোড়মিলানোরও অবসান ঘ'টবে। উধাও হবে—১৮-১৯ শতকীয় বৃটিশ বিশ্বায়নের প্রয়োজনে তৈরী বর্ণ-গর্বী আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ভাষা-পরিকল্পনার দুই প্রধান বায়বীয় দৈত্য।

১.৩ ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুচ্ছ বা ভাষা-পরিবার

এবার 'ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুচ্ছ' বা 'ভাষা-পরিবার' নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

একথা সত্য, ট্রাডিশনাল ধারায় ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুচ্ছ বা ভাষা-পরিবার তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় মা-বাবার-ই অলি-আওলাদ। সেই কল্পিত মূল ভাষা থেকে নাকি 'সেমিটিক' ও 'হেমিটিক' এই দুটো ভাষা-বংশের পয়দা। বিদ্বানরা এই 'সেমিটিক' ও 'হেমিটিক'কে 'কেন্তুম' ও 'শতম্' নামও দিয়েছেন।* তাঁদের মতে—এই দু'শাখার মধ্যে শতম্ শাখা থেকে 'ইন্দো-ইরানীয় আর্য্য-ভাষা'র জন্ম। আর তা ইরানীয়, দারদীয় ও ভারতীয় এই তিন কওমে বিভক্ত।

এবিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন—"যখন আর্য্য ভাষা-ভাষী জাতি মধ্য প্রাচ্য হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া ঈরান ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া আনুমানিক ১৫০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে....ভারত-উপমহাদেশে প্রবেশ করে, তখন তাহারা

* ইন্দো-ইউরোপীয় তথাকথিত মুলভাষার চার্ট পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল।

*হিন্দ্-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষাকওম

(আনুমানিক ৫০০০ খৃ. পূ. অব্দ)

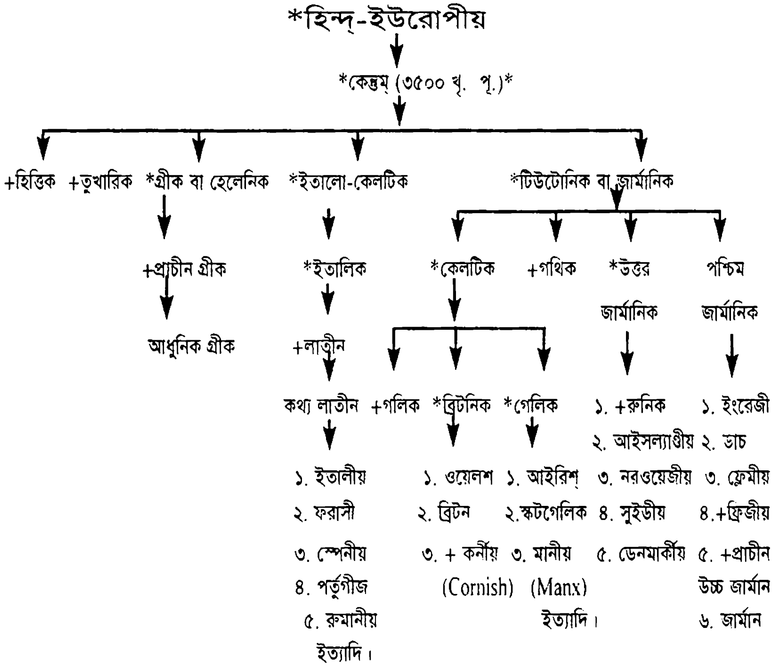

* ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-রচিত চার্ট অনুসারে 'কেন্তুম ও শতম্' শাখার চার্ট তৈরী করা হ'য়েছে ।

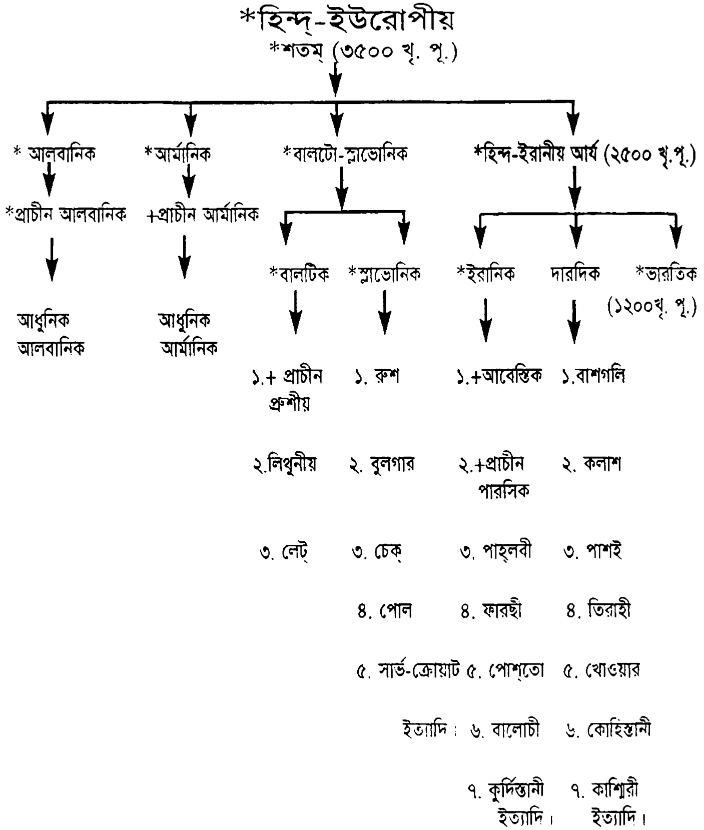
*হিন্দ্-ইউরোপীয়
*শতম্ (৩৫০০ খৃ. পূ.)
* আলবানিক
*আর্মানিক
*বালটো-স্লাভোনিক
*হিন্দ-ইরানীয় আর্য (২৫০০ খৃ.পূ.)
*প্রাচীন আলবানিক
+প্রাচীন আর্মানিক
*বালটিক
*স্লাভোনিক
*ইরানিক
দারদিক
*ভারতিক
(১২০০খৃ. পূ.)
আধুনিক আলবানিক
আধুনিক আর্মানিক
১.+ প্রাচীন প্রুশীয়
২.লিথুনীয়
৩. লেট্
১. রুশ
২. বুলগার
৩. চেক্
৪. পোল
৫. সার্ভ-ক্রোয়াট
ইত্যাদি।
১.+আবেস্তিক
২.+প্রাচীন পারসিক
৩. পাহ্লবী
৪. ফারছী
৫. পোশ্‌তো
৬. বালোচী
৭. কুর্দিস্তানী ইত্যাদি।
১.বাশগলি
২. কলাশ
৩. পাশই
৪. তিরাহী
৫. খোওয়ার
৬. কোহিস্তানী
৭. কাশ্মিরী ইত্যাদি।

যে-ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা ছিল ঈরানীয়, দারদীয় এবং হিন্দ্-আর্য্য (ভারতীয়) ভাষাগুলির জননী। ইহাকে হিন্দ্-ঈরানীয়.....ভাষা বলা হইয়াছে। .....কালক্রমে এই হিন্দ্-ঈরানীয়* মূল ভাষায় এক বিশেষ বিবর্তন ঘটে" এবং অপরাপর ভারতীয় ভাষার সৃষ্টি হয়।

অপর দিকে, আধুনিক ইরানী ভাষাতত্ত্ববিদ্ প্রফেসর পি.এন. খানলারি লিখেছেন—"This group, divided into two branches, Iranian and Indian, has preserved some of its very old records.The word *Arya*, from which *Eran* and *Iran* are derived, is the name given by the common ancestors of the Indians and Iranians to their family and race, Some of the Linguists had been wrongly using the term *Aryan* for the entire Indo-European Family of languages but **now the mistake has been corrected.**" (P.129).

জনাব খানলারির কথিত প্রাচীন 'আবেস্তীয়'ও 'বৈদিক' তথ্য-সূত্রের প্রাচীনত্ব ও 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা-নাম এবং পরিচয়ের অন্তঃসারশূন্যতার ওপর ইতোপূর্বে যথেষ্ট আলোকপাত করা হ'য়েছে। এবার সে-সব বিষয়ের বদলে খানলারি ইরানীয় ভাষা ও ভাষা-পরিবারের আরও কি পরিচয় দিয়েছেন—তা জানা যেতে পারে।

প্রফেসর খানলারি ইরানীয় ভাষা-কওমের মাঝে মিডিয়ান (Median),সাইথিয়ান (Scythian), প্রাচীন ফারছী (Old Persian) এবং আবেস্তার-ভাষাকে স্থান দিয়েছেন। তিনি আরও লিখেছেন—"The Scythians, Saramatians, Alanis and some other nomadic tribes of the Central Asia should also be regarded among the people of the Iranian race because their descendants in Khotan and Tumshuq or the Caucasus (Ossetic) spoke and are still speaking the Iranian languages.....There have been other groups of the people belonging to the Iranian race which had at least oral literature. Among them may be mentioned the Sogdians and Parthians who produced considerable literary works in the later periods. Similarly, the Bacterians and some other peoples were probably Iranians" (P.149).

---

*পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ডান পাশের চার্ট দেখুন

বলা দরকার যে, প্রফেসর খানলারি ফারছী ভাষার ঐতিহাসিক ধারাকে তিন পর্যায়ে ভাগ ক'রেছেন। তা হ'ল—

১. প্রাচীন যুগ (Ancient Period)।
২. মধ্য যুগ (Medieval Period)।
৩. আধুনিক যুগ (Modern Period)।

তাঁর ভাষায়—"1. Ancient Period begins from the oldest time concerning which documents and inscriptions in the Iranian languages have come down to us. It concludes with the fall of the Achamenian empire.

2. The Period of the Middle Iranian languages is reckoned from the beginning of the Parthian dynasty to the advent of Islam. However, some of the languages belonging to this period were current up to the third century Hijra (ninth century A.D).

3. The term *New Iranian* is applied to the languages and dialects, which have been prevalent in the vast land of Iran from the banging of the Islamic period, till now and have been in use in conversation or writing among the various Iranian communities. Most important of all of them is Dari Persian which has been and still is the official, administrative, literary and academic language during this long period and has served and is still serving as the means of mental and spiritual communication for all the Iranians."

প্রফেসর খানলারির ফারছী ভাষার বিকাশ-ধারার এ-ঐতিহাসিক পর্য্যায়-বিভাগ-এর পহেলা ও দোছরা পর্যায়, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা লেখক পষ্ট ক'রে ব'লেছেন—"It should be noticed that this division is related more to the structrre of language and the degree of its evolution than to the historical periods.

দৃশ্যমান বা লিখিত ও মৃত ভাষার গঠন বা অঙ্গ-সংস্থান (structure) এবং ভাষার তথা শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তনের পরিমাণ দিয়ে কখনও ঐতিহাসিককাল-নির্ভর যুগ-বিভাগ সম্ভব নয়। কারণ তা 'হঠাৎ' বা 'ধীরে ধীরে'—দু'রকমেই হ'তে পারে। অতএব, সকল ভাষার অতি প্রাচীন রূপের পর্যায়-বিভাগ কল্পনার ফুল-ফল

ছাড়া কিছু নয়।

যদিও খানলারি ইন্দো-ইরানীয় ভাষা তিন ভাগে ভাগ না ক'রে, দু'ভাগে ভাগ ক'রেছেন—'ইরানীয়' ও 'ভারতীয়' নামে; তথাপি—ঐতিহাসিক যুগের আগে—প্রত্ন-ঐতিহাসিক যুগে ইরানীয় ও ভারতীয় প্রাচীন জনকওম ও ভাষাকওম এক ও অভিন্ন ছিল কি না—তা আলোচনা করা দরকার। প্রত্ন-ঐতিহাসিক যুগে ইরানীরা ভারতে এসে সারা উপমহাদেশ দখল ক'রে নিয়েছে—এমন কোন প্রমাণ নেই। বরং পূর্বালোচনায় দেখা যায়, মহা প্লাবনের পরে আরবীয় জনকওম-(নির্দিষ্টভাবে সামী জনকওম)ই ইরান, মিশর, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম পর্যায়ে প্রাচীন আমলে, 'আবেস্তীয় যুগে'রও আগে আরবীয়রাই ইরানী আর্য্যদের পিতৃপুরুষ রূপে গণ্য হ'তে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে আবেস্তীয় যুগে তাঁদের কোন অংশ ভারতে বা হিন্দুস্তানে এলেও আসতে পারে। তবে তা খুব নিশ্চিত ক'রে বলার উপায় নেই। কারণ ভারতীয় জনস্রোতের মূল বৃহৎ স্রোতধারা আসে আরব দেশের মেসোপটেমিয়া ও তাঁর নিকটবর্তী এলাকা থেকে। তারা সারা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মত বিপুল সংখ্যায় আসতে পারেনি ব'লে মনে করা যায়। আধুনিক কালে যাদের দ্রাবিড় আখ্যা দেওয়া হয়, ঐ মূল স্রোতটি ভারতে তারাই সৃষ্টি করে। আর সেটা সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল ব'লে মনে করা যায়। এরপরে যারা আরবের বিভিন্ন এলাকা—সিরিয়া-মেসোপটেমিয়া-ইরান-মিশর থেকে ভারতে আগমন করে এবং দ্রাবিড়দের উৎখাত ও কোণঠাসা ক'রে পশ্চিম ও কালক্রমে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঘাঁটি গেড়ে বসে; তারা অনেক পরবর্তী কালের মানুষ। খানলারির মতে—"The Indo-Aryan languages are spoken in the greater part of the North Indian sub-continent. The area covered by them is surrounded by the Iranian languages in the north-west, by the Tibetan and Burmese in the north and north-east, by the Munda in the east and by the Dravidian in the south." (P.129).

অর্থাৎ আর্য্য ভাষী জনস্রোত যে ইরানীয় (আবেস্তীয়) ভাষা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে, তারা উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকাতেই আবদ্ধ ছিল। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে চালু ছিল তিব্বতী-বর্মী ভাষা, পূর্বে মুণ্ডা এবং দক্ষিণে দ্রাবিড়। বুঝতে কষ্ট হয় না—সিন্ধু ও পাঞ্জাবে বসবাসকারী উন্নত সভ্যতার অধিকারী আরব ভূমি থেকে আগত দ্রাবিড়রা তাদের থেকে শক্তিশালী আর একটি ঘোড় ছওয়ার, পশুপালক, প্রকৃতি-পূজারী—(অগ্নি, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি) পুরুষ-প্রধান

ইন্‌ভেডারদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে ক্রমে ক্রমে পেছনে হ'ঠতে হ'ঠতে দক্ষিণ ভারতে এসে হাজির হয়। তাদের কোন অংশ যে পূর্ব ভারতেও এসেছে, তা নৃতাত্ত্বিক আলোচনা থেকে জানা যায়। অতএব, ইরানীয় আর্য্যদের কোন শাখাই হোক, অথবা ইছলামের আবির্ভাবের সময়-ই হোক; যে সেমিটিক জনস্রোত বা আরবীয় জনকওম আরব ভূমি ত্যাগ ক'রে ভারতে আসতে বাধ্য হয়, তারা যেমন উত্তর-পশ্চিম ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল; সর্ব ভারতে ছড়িয়ে প'ড়তে পারেনি; তেমনি তাদের মুখের ভাষা—আরবীও প্রাচীন ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। খানলারি এ-সময়ের ভাষাকে ব'লেছেন—'প্রাচীন হিন্দী'। অথচ ভারতীয় এবং ইউরো-আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিকরা, একে বলেন—'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষা'। বাঙ্‌লাদেশী বিদ্বানরাও তাই ব'লে থাকেন।

তাঁরা আরও বলেন—এই 'প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা থেকে, কালোচিত পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার জন্ম।'একথা কতটা সত্য এবার তার ওপর আলোকপাত করা হবে।

১.৪ 'হিন্দ্‌-আর্য্য' ভাষা-গুচ্ছ বা ভাষা-পরিবার

বলা দরকার যে, স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, কাজী দীন মোহাম্মদ, রামেশ্বর শ্ব ওগয়রহ কমবেশী প্রায় সবাই "হিন্দ্‌-আর্য্য" বা 'ভারতীয় আর্য্য ভাষা' তথা 'সংস্কৃত ভাষা' থেকেই প্রাচীন ভারতীয়, মধ্য ভারতীয় ও প্রায় সমস্ত নব্য ভারতীয় ভাষার জন্ম ব'লে জানিয়ে আসছেন। তবে, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন মতও দিয়েছেন। যেমন—গত শতকের গোড়ার দিকে, 'ইঙ্গ-বঙ্গীয়' সকল ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ মনে ক'রতেন—ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত ভাষাই 'সংস্কৃতের দুহিতা'। এখন সে-দাবী টিকসই নয় বলে; কেউ কেউ বলেন—ভারতের সব ভাষা নয়, তবে বেশীর ভাগ ভাষাই 'সংস্কৃতের সন্তান'।

নৃবিজ্ঞানী ক্রোয়বার ট্রাডিশনাল ধারায় বিশ্বব্যাপী নানা ভাষা-পরিবারের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—'এশিয়া-মাইনরের কিছু ব্যতিক্রম বাদে 'পশ্চিম ইউরোপ থেকে উত্তর ভারত অবধি প্রচলিত সমস্ত ভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আওতাভুক্ত'। তিনি দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলোকে 'দ্রাবিড়' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন—"Southern India is Dravidian. While people of this family enter little into our customary thoughts." এর কারণ যে, তথাকথিত সংস্কৃতজ ভাষাগুলোর ওপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ—তা সত্য।

এই ধারায় স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, ড. রামেশ্বর শ্ব ওগয়রহ 'হিন্দ্‌-আর্য্য' বা

ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার অলি-আওলাদের যে-সব তালিকা দিয়েছেন, তাতেও বিবর্তনধারায় ভারতীয় ভাষাগুলোর তিন পর্যায়িক অদল-বদলের যে-ছক দেওয়া হ'য়েছে—তা হ'ল—'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষা, মধ্য যুগের ভারতীয় আর্য্য ভাষা ও আধুনিক যুগের ভারতীয় আর্য্য ভাষা'। এ-গুলোকেই বলা হয়—

১.প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা,
২. মধ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা ও
৩. নব্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা।

এই তিন পর্যায়ের মধ্যে শেষ পর্যায় বা আধুনিক পর্যায়ের ভাষা-পরিবর্তনে স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সনের মত্, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কবুল করেননি। তিনি ড. সুনীতিকুমারের ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার বিবর্তন ধারাও মেনে নেননি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন—"ভারতীয় আর্য্য ভাষাকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত করিতে পারি।

১. আদিম স্তর বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan) এবং আদিম প্রাকৃত (১২০০–৫০০পূ. খ্রী.)।

২. মধ্য স্তর বা মধ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা* (Middle Indo-Aryan)। ইহার তিনটি উপস্তর আছে।.....প্রথম উপস্তর, দ্বিতীয় উপস্তর ও তৃতীয় উপস্তর।

৩. আধুনিক স্তর বা আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষা (New Indo-Aryan)। প্রাচীনতম রূপ ৬৫০ খ্রী. হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত।"*

নজর ক'রলে দেখা যায়, ড. শহীদুল্লাহ্ 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা' এবং 'অদিম প্রাকৃত' ব'লে দু'টি ভাষা বা দু'শ্রেণীর ভাষা-(এক শ্রেণীতে কেবল আর্য্য বা সংস্কৃত ভাষা; অপর শ্রেণীতে সবরকম 'প্রাকৃত' বোল-বুলি)র কথা ব'লেছেন। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষার ব্যাখ্যায়, এর প্রথম উপস্তরকে ব'লেছেন,—"প্রাচীন প্রাকৃত।" তাহ'লে, তাঁর 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা'; যে, 'আদিম প্রাকৃত' বই কিছু নয়—তা না-কবুল করা চলে না। তিনি লিপি ও সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর ভরসা ক'রে মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষাকে চারটি উপস্তরে বা উপযুগে বিভক্ত ক'রেছেন। তাহ'ল—প্রথম উপস্তর (৫০০-১০০ খৃ.অ.), সন্ধি উপস্তর (১০০-খৃ.অ.–২০০ খৃ. অ.)। দ্বিতীয় উপস্তর (২০০–৪৫০ খৃ. অ.), তৃতীয় উপস্তর (৪৫০-৬৫০খৃ. অ.)। এসব কাল্পনিক যুগ-বিভাগ অবাস্তব। কারণ লিপির ভিত্তিতে ভাষার যুগ-বিভাগ হ'তে পারে না। এক-ই যুগে, এক-ই ভাষা, বিভিন্ন লিপিতে যেমন লেখা হয়; তেমনি তা এক-ই লিপির নানা রকমভেদেও লেখা যায়। তাছাড়া,

* ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-নির্দেশিত তথাকথিত 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা' ও 'মধ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা'র চার্ট পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

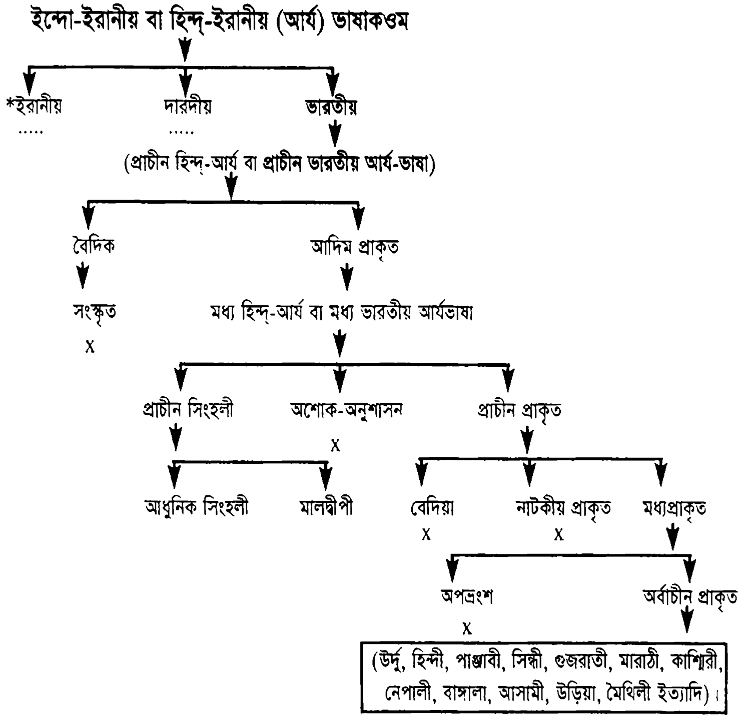
ইন্দো-ইরানীয় বা হিন্দ্-ইরানীয় (আর্য) ভাষাকওম
*ইরানীয়
.....
দারদীয়
.....
ভারতীয়
(প্রাচীন হিন্দ্-আর্য বা প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা)
বৈদিক
সংস্কৃত
x
আদিম প্রাকৃত
মধ্য হিন্দ্-আর্য বা মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা
প্রাচীন সিংহলী
অশোক-অনুশাসন
x
প্রাচীন প্রাকৃত
আধুনিক সিংহলী
মালদ্বীপী
বেদিয়া
x
নাটকীয় প্রাকৃত
x
মধ্যপ্রাকৃত
অপভ্রংশ
x
অর্বাচীন প্রাকৃত
(উর্দু, হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাতী, মারাঠী, কাশ্মিরী, নেপালী, বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী ইত্যাদি)।

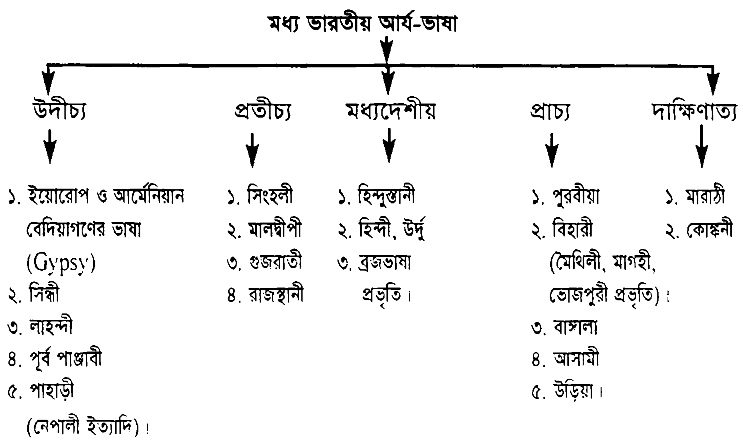
মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষা
উদীচ্য
১. ইয়োরোপ ও আর্মেনিয়ান বেদিয়াগণের ভাষা (Gypsy)
২. সিন্ধী
৩. লাহন্দী
৪. পূর্ব পাঞ্জাবী
৫. পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)।
প্রতীচ্য
১. সিংহলী
২. মালদ্বীপী
৩. গুজরাতী
৪. রাজস্থানী
মধ্যদেশীয়
১. হিন্দুস্তানী
২. হিন্দী, উর্দু
৩. ব্রজভাষা প্রভৃতি।
প্রাচ্য
১. পুরবীয়া
২. বিহারী (মৈথিলী, মাগহী, ভোজপুরী প্রভৃতি)।
৩. বাঙ্গলা
৪. আসামী
৫. উড়িয়া।
দাক্ষিণাত্য
১. মারাঠী
২. কোঙ্কনী

সবাই এক মত নন। ঐ সব ভাষাতাত্ত্বিক মূল 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা'র ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যে অশোক লিপি, সাঁচি লিপি, ভর্হুত লিপির ভিত্তিতে মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার 'প্রথম উপস্তর' নির্দেশ ক'রেছেন—সে-সবের মধ্যে বহুল-প্রচারিত অশোক লিপির আসল রূপ অন্য রকম।

অশোক ও অশোক লিপি

অশোক, অশোক-স্তম্ভ ও অশোক-লিপি-বিষয়ে আধুনিক ভারতীয় গবেষক-গণ জানিয়েছেন—"ভারতের নানান জায়গায় বেশ কয়েকটি অশোক-স্তম্ভ পাওয়া গেছে ব'লে পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরেও ঐ স্তম্ভের দু'টি নিদের্শন রাখা আছে... ঐ সব স্তম্ভের কোনটাতেই অশোকের নাম খোদাই ক'রে রাখা হয়নি—রাখা হয়নি কোথাও। নাম-ই—রাখা হয়নি কোনও লিপিরও। আজ যাঁরা অশোকস্তম্ভের চিত্ররূপের নিচে 'সত্যমেব জয়তে' বাণী লিখে ভারত-সরকারের একটি প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ব'সেছেন, তাঁরা জানেন না—ঐ স্তম্ভের সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই—সম্পর্ক নেই অশোকের—সম্পর্ক নেই বৌদ্ধধর্মেরও। সত্যের জয় ঘোষণার বাণী লেখার ব্যবস্থা হ'লেও **প্রতীকটি অনেক মিথ্যার প্রকাশ** ঘটিয়েছে।"

"আঠারোশ' আঠারো খৃষ্টাব্দের আগে প্রকাশিত ইতিহাসে অশোক-এর নামগন্ধ নেই। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এইচ, এইচ, উইলসনের 'স্যান্‌সক্রিট-ইংলিশ ডিক্সনারী'তে'আশোক' শব্দটা রাখা হ'য়েছিল। রাখা হ'য়েছিল একটি গাছের নাম হিসাবে, কোন সম্রাটের নাম হিসাবে নয়।" **ভারতের 'শ্রেষ্ঠ-সম্রাট'-এর নামটা তখনও পর্যন্ত ঠিক ক'রে উঠতে পারেন নি নেপথ্যে থাকা পণ্ডিতেরা**। 'ইংরেজী ও বাংলা মহাভারতে' না থাকলেও ঐ অশোকের প্রসঙ্গ সংস্কৃত মহাভারতে রাখা হ'য়েছে।... বুঝতে কষ্ট হয় না সংস্কৃত মহাভারতের ঐ অশোকের তথ্যসমৃদ্ধ অংশটি ১৮১৯-এরও পরে লেখা হ'য়েছে।"

কেবল অশোক নয়—অন্য অনেকের অনেক লিপি (শিলালিপি, তাম্রলিপি, পাণ্ডুলিপি) নিয়েই যে রকম জাল-জালিয়াতির খেল খেলা হ'য়েছে—তা হয়তো ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জানা ছিল না। কারণ সচেতন ভাবেই এ-সব "সুকম্মে"র সাথে "যবন"দের জড়ানো হয়নি।

এক-ই ভাবে আর্য্যলিপি-(অশোকাদির লিপি—ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, নাগরী, সংস্কৃত সহ)র মত, আর্য্য সাহিত্যের (পাণিনীর ব্যাকরণ সহ) অথেন্‌টিক রূপের কৌতুককর 'অথেন্‌টিসিটি'র ওপরও ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হ'য়েছে। ফলে,

'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা', 'মধ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা'র কাল্পনিক পরীর জগৎ-পরিক্রমা বাদ দিয়ে নব্য ভারতীয় বা "আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষা"র যুগ তার হাল-হকিকতের পরিচয় নেয়া জরুরী। 'নব্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা'র শাখাদি দেখাতে স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন-এর মত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গ্রহণ করেননি। তিনি লিখেছেন—"আমি মনে করি 'নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা'গুলিকে নিম্ন লিখিত রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত"।*

এক-ই ভাবে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড.সুনীতিকুমার-এর 'নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা'- (প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষার কালাকালসহ)র কাল-নির্ণয় মানেননি। তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে লিখেছেন—"দুঃখের বিষয় আমি ড. চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত কাল নির্ণয় স্বীকার করিতে পারি না।"

শুধু প্রাচীন লিপি ও সাহিত্য নয় এ-যুগের অনেক আধুনিক ভাষানামও যে, কাল্পনিক এবং ১৮-১৯ শতকের সৃষ্টি—তাও সত্য। যেমন—ব্রজবুলি বা ব্রজভাষা, বঙ্গ-কামরূপী ভাষা ইত্যাদি।

কিন্তু 'প্রাচীন ভারতীয়, মধ্য ভারতীয় ও নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা'- নামকরণের মধ্যেই যে চালাকি-চাতুরী, মিথ্যার বেসাতি আর মায়া-মরিচীকা র'য়েছে—এবার সে-বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৪

ঐ সব যুগ-নামের যৌক্তিকতা

আসল কথা হ'ল—এক বিশাল বিশ্বভাষা-প্রকল্পের আওতায় হিন্দুস্তান-উপমহাদেশের ভাষা-বিবর্তন ও নতুন নতুন ভাষা আর সাহিত্য সৃষ্টির যে মোহনীয় যুগ-প্রকল্প বহুকাল ধ'রে প্রচার ক'রে আসা হ'চ্ছে, সেই সব যুগ-বিভাগের যুক্তি ও ভিত্তি কি?

এ-বিষয়ে নিরপেক্ষ তত্ত্ব-তালাশের খাতিরে বলা দরকার, আপনা-আপনি কখনো কোন লিপি-ভাষার ব্যাপক রদ-বদল হয় না। চৈত্র মাসে গাছের পাতা ঝরার মত; কোন দেশের, কোন যুগের, কোন ভাষাই তার সব ফুল-ফল-পাতা বা সে-গুলোর চেহারা-ছুরৎ ঝরিয়ে দিয়ে, দু'এক মাসের মধ্যে কচিপাতা, জালি ফুল আর নয়া রূপ-চেহারা নিয়ে হাজির হয় না। কারণ যে-কোন জাতির লিপি-ভাষা-সাহিত্যের চেহারা-ছুরৎ দু'রকমে, দু'কারণে বদলায়।

১. স্বাভাবিক কারণে—স্বাভাবিক ভাবে।

২. আকস্মিক কারণে—অস্বভাবিক ভাবে।

---

*তাঁদের চার্ট পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন-এর মতে—
নব্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষাগুলোর সম্বন্ধ নিম্নলিখিতরূপে
নির্দেশ করা উচিত

নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষা

- প্রতীচ্য
  - ১. সিন্ধী
  - ২. লাহন্দী
  - ৩. কাশ্মিরী
- মধ্যদেশীয়
  - ১. পশ্চিমা হিন্দী
  - ২. পাঞ্জাবী
  - ৩. রাজস্থানী
  - ৪. গুজরাতী
  - ৫. পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)।
- মধ্যবর্ত্তী
  - পূরবীয়া (আওধী ইত্যাদি)।
- প্রাচ্য
  - ১. বাঙ্গলা
  - ২. আসামী
  - ৩. উড়িয়া
  - ৪. বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া)।
- দাক্ষিণাত্য
  - ১. মারাঠী
  - ২. কোঙ্কনী

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন—
নব্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষাগুলো নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ
করা অধিকতর যুক্তি-যুক্ত

নব্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা

- প্রতীচ্য
  - ১. সিন্ধী
  - ২. লাহন্দী
  - ৩. পূর্ব পাঞ্জাবী
  - ৪. কাশ্মিরী
- মধ্যদেশীয়
  - ১. হিন্দুস্তানী (হিন্দী, উর্দু)
  - ২. রাজস্থানী
  - ৩. গুজরাতী
  - ৪. পাহাড়ী (নেপালী ইত্যাদি)।
  - ৫. ব্রজভাষা (খড়ী বোলী)।
- মধ্যবর্ত্তী
  - ১. আওধী
  - ২. বাঘেলী
  - ৩. ছত্তিসগড়ী
  - ৪. নাগপুরিয়া
- প্রাচ্য
  - ১. বিহারী (মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া)
  - ২. ওড্র-বঙ্গ-কামরূপী
    - উড়িয়া
    - বঙ্গ-কামরূপী
      - বাঙ্গলা
      - আসামী
- দাক্ষিণাত্য
  - ১. মারাঠী
  - ২. কোঙ্কনী

যে-সব ভাষা—স্বাভাবিক কারণে-স্বাভাবিক ভাবে বদলায়; সে-সব ভাষার লিপির বদল তেমন না ঘ'টলেও ভাষা, বানান, শব্দ-সম্পদের নানা কিছিমের বদল ঘ'টতে পারে এবং ঘ'টে থাকে। এটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতই সকলের আগোচরে ঘটে।

কিন্তু যে-সব ভাষা—আকস্মিক কারণে—আকস্মিক ভাবে বদলায়; বদলায় লিপি, ভাষা, বানান, শব্দসম্পদ—সে-সব ভাষার ওপর সুনিশ্চিত ভাবে কোন-না কোন রকম রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চাপ প'ড়ে থাকে। তা দেশীয় রাজনৈতিক চাপও হ'তে পারে; বিদেশী রাজনৈতিক চাপও হ'তে পারে। দেশীয় রাজনৈতিক চাপে লিপি-বদলের নজীর পাওয়া যায়—কামাল পাশার তুরস্কে। আর বিদেশী রাজনৈতিক চাপে ভাষা-বদলের আধুনিক নজীর ইংরেজ-অধিকৃত আমেরিকা। কেবল 'হাল' আমলে নয়, পুরানো আমলেও যে, এরকম ঘ'টেছে—তার নজীর মুছলিম-অধিকারের পর ইরান, মিশর, স্পেন; আর বৃটিশ-অধিকারের পর আয়ার্ল্যাণ্ড ইত্যাদি। এরকম আরও ঐতিহাসিক নজীর দিয়ে দেখানো যায়—যে-কোন যুগের, যে-কোন দেশের, যে কোন জাতির, যে-কোন ভাষাই আকস্মিক পরিবর্তনের কবলে প'ড়েছে—অন্য জাতির দখলদারিত্বে, নেতৃত্বে, নির্দেশনা-পরিচালনায়, প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে। মূলতঃ ব্যাপক, গভীর শত শত বছর স্থায়ী—এক জাতির বা এক দেশের ওপর অন্য দেশ, অন্য জাতির শক্তিশালী রাজনৈতিক অধিকার এবং সেই জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ওগয়রহের অব্যাহত চাপেই পরাজিত জাতির লিপি-ভাষা-সাহিত্য বদলায়।

এ-বদল আধুনিক কালে খুব দ্রুত হ'তে পারে। কিন্তু প্রাচীনকালে তা হ'য়েছে—ধীরে ধীরে।

ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষা

এখন দেখা দরকার প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষার স্তর-বদল কোন্ পথে হ'য়েছে।

যদি ধ'রে নেওয়া হয়—(সেটাই ধরা হ'য়ে থাকে) এ-বদল ধীরে ধীরে ঘ'টেছে এবং শত শত নয়, হাজার হাজার বছর ধ'রে ঘ'টেছে। তাহ'লে—একথাও ধ'রে নিতে হয়—ঐ হাজার হাজার বছর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে ভারত পর্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগের কথা বাদ দিলেও, গোটা ভারত উপমহাদেশ—আর্য্যজাতি ও আর্য্য ভাষা-(সংস্কৃত)র রাজনৈতিক অধিকারে কখনও ছিল কি? তা ছিল–একথা কেউ হলফ ক'রে ব'লতে পারবেন না। তাহ'লে, ঐ কাল্পনিক ভাষা-প্রকল্পের কাল্পনিক

যুগ-বিভাগের তত্ত্ব-বিলাসের শিকার হ'য়ে যাঁরা "প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা"র কথা বলেন; তাঁদের এই সংগত প্রশ্নের জওয়াব দেয়া জরুরী যে, তথাকথিত **প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার** সময় ১২৫০ থেকে ৫০০ খৃ.পূ-এর সমগ্র সময়ে কি সমগ্র ভারতবর্ষ (তখনকার নাম 'হিন্দুস্তান') আর্য্য রাজশক্তির অধিকারভুক্ত ছিল? ঐ সময়ে কি সারা উপমহাদেশে চালু ছিল সংস্কৃত ভাষা? এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভাষা কি তখন সারা আর্যাবর্তেও ছিল? প্রমাণ কোথায়?

যদি তার প্রমাণ দেওয়া না যায়, আর তথাকথিত আর্য্য জনকওমের প্রতিপত্তি কেবল এক স্থানে সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, সারা উপমহাদেশ জুড়ে তাদের প্রভুত্ব ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থেকে থাকে, তা হ'লে, কেবল পশ্চিম ভারতের একাংশের দখলদার আর্য্যদের ভাষাকে ভারতের প্রায় তাবৎ ভাষার 'প্যারেন্ট স্পীচ' ব'লে মনে করার কোন যুক্তি নেই। বিশেষ ক'রে, ঐ ভাষা তো তখন ছিল কেবল 'আর্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ' শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অলিখিত। এরকম একটি শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ বংশানুক্রমে মুখেমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত 'ভাষা' থেকে কোন নতুন ভাষা পয়দা হওয়া তো দূরের কথা; সে-ভাষার বিবর্তন-পরিবর্তন ঘটাও সম্ভব কি না, তা একটু চিন্তা ক'রলেই বোঝা যায়। কারণ 'আর্য্য' ব্রাহ্মণরা কি কখনও কোন যুগে জনগণের সঙ্গে মিশেছেন? বাক্যালাপ বা ভাব-বিনিময়, ভাষা-বিনিময় ক'রেছেন তাঁরা 'অন্-আর্য্য'দের সাথে? তাঁরা তাদের কখনও নিজেদের কাছে ডাকা তো দূরের কথা—ঘর, মঠ-মন্দিরের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে দেননি। ব্রাহ্মণদের 'সংস্কৃত' বা 'পবিত্রকৃত' ভাষা-সাহিত্য প'ড়তে-শুনতে দেওয়া তো দূরের কথা। এ-সম্পর্কে পাঠক নিশ্চয়-ই জানেন, শূদ্র তথা অন্-'আর্য্য'-অব্রাহ্মণদের কেউ 'সংস্কৃত' ভাষায় তৈরী 'বেদ'-এর শ্লোক-পাঠ শুনলেও র'য়েছে কানের মধ্যে গরম গলানো শিশা ঢেলে দেবার বিধান। এবিষয়ে 'হাজার বছর আগে' সিদ্ধাচার্য সরোজ বজ্র লিখে গেছেন—"যদি বল—সংস্কারে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, চণ্ডালকে সংস্কার দাও, সে-ব্রাহ্মণ হোক। যদি বল,—বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও তো। ব্যাকরণের মধ্যে তো বেদের শব্দ আছে।" বলা দরকার যে, শূদ্র অর্থ কেবল 'চণ্ডাল' নয় সমস্ত অন্'আর্য্য'-ই শূদ্র। তার অর্থ 'আর্য্য' জাতি ও আর্য্য ধর্ম-বহির্ভূত সকলেই শূদ্র। বৌদ্ধ, খৃষ্টান-মুছলমানরাও তাই। এজন্য সরোজ বজ্র যে-

ব্যাকরণ-পড়া-চণ্ডালদের কথা ব'লেছেন—তারা আসলে 'আর্য্য'-ধর্ম-বহির্ভূত জৈন-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত জন। এটা পাল যুগের কথা। প্রাচীন 'ভারতে', বৌদ্ধপূর্ব আমলে অ-ব্রাহ্মণ বা অন্-'আর্য্য' জনগণের কোন অংশের-ই বেদ-ব্যাকরণ পাঠের সুযোগ ছিল না। একারণে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে জনসাধারণের কোন রকম কালচারাল 'ইন্টার-অ্যাকশন' না থাকায় তথাকথিত আর্য-ভাষা 'সংস্কৃত' থেকে, কোন নতুন ভাষার উদ্ভব বা ঐ ভাষাটিরও বিবর্তন-পরিবর্তন হ'তে পারেনি। হওয়া সম্ভব নয়। তাই 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা' থেকে 'মধ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উদ্ভব'-কথাটা ডাহা মিথ্যা, অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয়।

খ) মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা

এবার তথাকথিত **'মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা'** সম্পর্কে বলা দরকার। ড. কাজী দীন মোহাম্মদ 'মধ্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা'র যে-যুগ খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে খৃষ্টীয় ৬৫০ অব্দ পর্যন্ত নির্দেশ ক'রেছেন—সে-সময়ও কি সারা উপমহাদেশের হিন্দুস্তান নামের বদল ঘ'টে ভারত হ'য়েছে? অথবা সারা উপমহাদেশে বা ভারতে 'আর্য্য-ধর্ম', 'আর্য্য-ভাষা' ও 'আর্য্য-রাজশক্তি' কায়েম হ'য়েছে? অথবা সারা উপমহাদেশে 'আর্য্য' ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি হ'য়েছে এবং সকল ধর্মবর্ণের 'লোক'—'আর্য্য' সমাজের অন্তর্ভূক্ত হ'য়ে প'ড়েছে? বিস্তৃত হ'য়েছে—সকল অন্-'আর্য্য' জনসমষ্টির ওপর 'আর্য্য-ধর্ম', 'আর্য্য-ভাষা' ও 'আর্য্য-সাহিত্যে'র প্রভাব-প্রতিপত্তি? এই যুগে যদি একক একটি রাষ্ট্রবন্ধন, ভাষা-বন্ধন, ধর্মবন্ধন সৃষ্টি না হ'য়ে থাকে এবং তথাকথিত সংস্কৃত ভাষার বিকাশ-বিবর্তন না ঘ'টে থাকে; তাহ'লে, ঐ কাল পরিধি- (৫০০খৃ. পূ. থেকে ৬৫০ খৃ. অব্দ) কে 'আর্য্য' যুগ বলা চলে না। আসলে ঐ যুগ তো 'বৌদ্ধ'-যুগ। বৌদ্ধ ধর্ম ও পালি ভাষার-ই যুগ; যা সংস্কৃতকে বর্জন-দমন ক'রে বিকশিত ও বিস্তৃত হয়। কাজেই সামান্যতম ইতিহাস-চেতনা থাকলেও এযুগকে কিছুতেই 'মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার যুগ' বলা যায় না।এ-যুগ বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ ভাষা (পহেলা পালি, পরে তার সাথে, বৌদ্ধ-সংস্কৃত) ও বৌদ্ধ জনগণের রাষ্ট্র-শাসন আর সভ্যতার যুগ। এই যুগটি বাঙালা দেশে আসে আরও প্রায় এক শ' বছর পরে—৭৫০ খৃষ্টাব্দে। এ-অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধ ভাষা, বৌদ্ধ রাজশক্তি ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বিশাল প্লাবনকে অস্বীকার ক'রে, পালিভাষার অসাধারণ অবদান ও প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা ক'রে, 'অনার্য্য' কৃতিত্বধন্য 'বৌদ্ধ যুগ' নামের স্থানে কাল্পনিক 'আর্য্য'-কতিত্বপূর্ণ 'মধ্য ভারতীয় আর্য্যযুগ' নামকরণ কেবল অন্যায় নয়; অনৈতিহাসিকও।

'অন্যদিকে খৃষ্টীয়' ৬৫১ থেকে ১২০০ সাল তক কালকে যদি 'মধ্য যুগ' ব'লে গণ্য করা হয়; তবে এযুগের আর্য্য-ইতিহাস কেবল ব্রাহ্মণদের মিথ্যার ইতিহাস; কোন গঠনমূলক সভ্যতার ইতিহাস নয়। কাজেই এসময়ে আর্য্য ভাষার মত একটি কুলুঙ্গিবদ্ধ শ্রেণী-ভিত্তিক ভাষা থেকে অপর কোন ভাষার বিবর্তন বা উদ্ভব ঘটা সম্ভব নয়; রূপ-রূপান্তর লাভও অসম্ভব। পাণিনীর ব্যাকরণ-শাসিত সংস্কৃত ভাষাই ছিল এই কালের আর্য্য ভাষার বা সংস্কৃতের ভিত্তি। এটা একটা কথার কথা মাত্র। 'চান্দ্র-ব্যাকরণ' ছিল তখনকার আদর্শ। সে-ভাষাও তথাকথিত আর্য ব্রাহ্মণদের আদর-কদর পায়নি। বরং তা "বৌদ্ধ সংস্কৃত" ব'লে নিন্দিত হ'য়েছে। এক-ই ভাবে নিন্দিত হ'য়েছে,—তার আগেকার জৈনদের ভাষা ও সাহিত্য—"জৈন প্রাকৃত"। এ-রকম ভাবে নিন্দিত হ'য়েছে—পরবর্তীকালে, মুছলিম যুগের মুছলমানদের তৈরী ভাষা (বাঙালা) ও সাহিত্য: 'ইছলামী বাঙালা' (ইছলামি বাংলা), 'মুছলমানী বাঙালা', 'পুথি সাহিত্য' ইত্যাদি ব'লে। মোটের ওপর, আর্যত্ববাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পাণিনী-সংস্কৃতের বহির্ভূত কোন ভাষা, সেই সংস্কৃতে রচিত সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন সাহিত্য, আর্য জনমণ্ডলী ছাড়া অন্য কোন জনগোষ্ঠী এবং আর্য-ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে কখনও স্বীকার করেনি; কাছে টানেনি কিংবা সে-সবের কাছেও যায়নি। এ-অবস্থায় মধ্যযুগীয় ভারতে 'সংস্কৃত ভাষা' ব'লে কোন চীজ থাকলেও, সেই সংস্কৃত ভাষারও বিবর্তন-পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। ফলে, আধুনিক পণ্ডিতদের গ'ড়ে তোলা 'মধ্য যুগীয় আর্য্যভাষা ও সাহিত্য', নামেই কেবল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। গোটা উপমহাদেশের অন্য কোন ভাষাই এর মধ্যে পড়েনা; আসেনা। আর তথাকথিত সংস্কৃত যেহেতু ছিল অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবদ্ধ; সেই কারণে মধ্য যুগীয় ভারতের গোটা ভাষা-পরিবেশকে ঐ নাম দেয়া যায় না। 'মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা'—নামটি তাই অবাস্তব—কাল্পনিক।

গ) নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা

এক-ই ভাবে, **'নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা'** নামক যুগ-বিভাগটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অষ্টম শতাব্দী থেকে ধ'রলেও, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে সারা হিন্দুস্তান বা ভারত, আর্যদের দখলে বা আর্যভাষা, আর্য সাহিত্য ও আর্যধর্মীয় রাজপুরুষদের শাসনে ছিল না। কাজেই এ-সময়টিকে ভারতে আর্য-যুগ ব'লে চিহ্নিত হবে কোন্ সূত্রে? কোন্ কারণে? কোন্ যুক্তিতে? কোন্ ভিত্তিতে? এ-সময় সংস্কৃত ভাষা থেকে কি উপমহাদেশের একটি ভাষাও উৎপন্ন হ'য়েছে বা হ'তে পেরেছে? তা পারেনি ব'লেই, চর্যাপদকে যারা বাঙালা রচনা ব'লে স্বীকার করেননি, তারা ঠিক কাজ-ই ক'রেছেন। বাঙালা-লিপি সম্পর্কে গবেষণা ক'রতে গিয়ে গত

পাঁচ বছরের (১৯৯৪-১৯৯৮) বিশেষ অধ্যয়নে বুঝতে পেরেছি; চর্যাপদের ভাষা—সত্যিকার অর্থে বাঙালা নয়। তবে কবুল ক'রতে কুণ্ঠা নেই, এ-সম্পর্কে, পূর্বে আমারও ধারণা ছিল ভুল। প্রকৃত তথ্য হ'ল—ঐ ভাষা ও লিপি 'বঙ্গ'দেশের পার্শ্ববর্তী এলাকা—'অঙ্গে'র ভাষা ও লিপি। আর তার ওপর প্রচুর আধুনিক উপাদান পলিমাটির মত প্রক্ষিপ্ত হ'য়েছে। সেজন্য দীনেশচন্দ্র সেন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন চর্যাপদকে 'হিন্দী' ব'লেছেন। কেউ কেউ 'চর্যাপদ'কে আধুনিক কালে বানানো প্রাচীন বাঙালার নমুনা ব'লেও উল্লেখ ক'রেছেন।

তাই, **অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে কোন অর্থেই নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার কাল বলা যায় না**। কেননা, তখন গোটা উপমহাদেশের অধিকাংশই ছিল—মুছলিম শাসনাধীনে; আর্য্য-শাসনাধীন নয়। তখন ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে মুছলমান জনগোষ্ঠী ক্ষমতাসীন। তাদের গণমুখী ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ও সভ্যতা 'মধ্য যুগীয় ভারতে'র অচলাবস্থার অবসান ঘটায়। মুছলমান শাসক ও আলেম-উলামারা, ব্রাহ্মণদের বিদ্যার তোয়াক্কা না ক'রে, নিজেদের বিদ্যা, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য; ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে, সকল প্রজার জন্য সুলভ ক'রে দেন। ব্রাহ্মণদের মত মুছলমানদের যেহেতু ধর্ম-বিদ্বেষ, ভাষা-বিদ্বেষ ও জনবিদ্বেষ ছিল না এবং আরবী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় তারা কোরআন-হাদীছ প'ড়লে, 'রৌরব' নরকের মত কোন দোজখে যাবার বিধান ছিল না; কিংবা অমুছলমানরা কোরআন-হাদীছ পাঠ শুনলে, তাদের কানে শিশা ঢেলে দেবার কোন আইন তাঁরা করেননি; মুছলমানরা অতি নিম্নস্তরের দেশীয় মানুষকেও ইছলামী ভ্রাতৃত্বের আওতায়, তাঁদের লিপি-ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম সব-ই গ্রহণের অধিকার দেন; সেই কারণে ঐ কালের স্থানীয় ভাষার সঙ্গে 'বিদেশী' মুছলমান শাসক ও পীর-দরবেশদের ভাষাবাক্য মিশে সারা 'ভারতে' নানা এলাকায় নানা স্থানীয় নামের নতুন নতুন ভাষা সৃষ্টি হয়। এছাড়া, সৃষ্টি হয়—গোটা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে একটি বিশাল লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা—যার নাম হিন্দুস্তানী, পরবর্তী নাম উরদু ও হিন্দী। 'ভারতে'র ভাষা-পরিবেশে, এরকম নতুন যুগ এর আগে আর কখনও আসেনি। নতুন ভাষা তৈরীর এমন পরিবেশও নয়। ফলে, এই সময়ে আরবী, তুরকী ও ফারছী ভাষার সঙ্গে নানা—দেশীয় (স্থানীয়) ভাষা মিলিয়ে-মিশিয়ে মুছলমানরা যে-সব নতুন নতুন ভাষা সৃষ্টি করেন সেগুলো "ভারতে"র নতুন যুগের "আর্য্যভাষা" বলা চলে কি ভাবে? কি ভাবে ইছলাম ধর্ম ও মুছলিম জনকওমের এ-কৃতিত্ব প্রতিস্থাপিত হ'তে পারে আর্য্য-ধর্ম, আর্য্য-ভাষা ও আর্য্য-জনগোষ্ঠীর দ্বারা? এ-যুগে কি সারা ভারতে আর্য্য আধিপত্য; বা আর্য্য রাজশক্তি, আর্য-ধর্ম, আর্য্য-ভাষা, আর্য্য

জনগোষ্ঠী ইত্যাদি যা-ই হোক, তার কোনটির কোন প্রাধান্য বা বিস্তৃতি ছিল? অথবা ঐ সময় এবং দ্বাদশ-শতক-পরবর্তী কালে, উপমহাদেশের এই পূর্বাংশের বা অন্য কোন অংশের কোন ভাষা কি সংস্কৃত ভাষা থেকে পয়দা হ'তে পেরেছে? তা না পেরে থাকলে, 'নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা' নামটির সঠিকতা নিয়ে দ্বিতীয় চিন্তার নিশ্চয়-ই অবকাশ আছে।

কেননা, তখনও সারা উপমহাদেশের নাম ভারত নয়; 'হিন্দুস্তান'। সে-হিন্দুস্তান ও আর্যরা শাসন ক'রত না; শাসন ক'রত মুছলমানরা। ধর্ম, ভাষা, জনগোষ্ঠীর সমকালীন চারিত্র্য ছিল—আর্য্যামী–বহির্ভূত । সে–সময় সারা হিন্দুস্তানের নানা রাজ্য, নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়—রাজনীতি ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা, শিক্ষা,সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে ছিল ঐক্যবদ্ধ। খৃষ্টীয় চোদ্দ শতক থেকেই বঙ্গ-গৌড়ের অবস্থা মুছলিম শাসনাধীনে বদলাতে থাকে। ঐ সময় থেকে মুঘলরাই সারা হিন্দুস্তানকে সকল রকমে এক ও ঐক্যবদ্ধ করে। তারাই সারা হিন্দুস্তানে একটি মাত্র লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা তৈরী করে—যার নাম এই সেদিনও ছিল 'হিন্দুস্তানী'। শুধু কি হিন্দুস্তানী বা উরদু-হিন্দী? খড়ি বোলি, রেখতা, মালয়ালম প্রভৃতির মত ভারতের প্রায় ৫০/৬০ টি হিন্দুস্তানী ভাষা হিন্দুস্তানী মুছলমানদের-ই সৃষ্টি। আর এসব ভাষা-সৃষ্টির প্রতি ক্ষেত্রেই তথাকথিত আর্য্যরা নানা রকম প্রবাদ, শ্লোক, বিধিবিধান রচনা ক'রে বাধা দিয়ে এসেছে। তা ক'রেছে, কেবল বাঙালা দেশের বাঙালা ভাষার বিরুদ্ধে নয়; সারা উপ-মহাদেশের সকল প্রাদেশিক ভাষার বিরুদ্ধে।এ-অবস্থায় "নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ" যে, আসলে 'ইন্দো-ইরানী'য় বা 'ইন্দো-আরবীয় ভাষা ও সাহিত্যের যুগ'—তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-কালের নতুন হিন্দুস্তানে, ইন্দো-ইরানীয় ভাষা বা ফারছী-তুর্কী-আরবী ভাষাকে অবলম্বন ক'রেই সমস্ত স্থানীয় অবহট্‌ঠ-অপভ্রংশ ভাষা—নতুন রূপ লাভ ক'রে শক্তিশালী ও শিষ্ট সাহিত্যের ভাষা-বাক্যে পরিণত হ'তে সমর্থ হয়। সমর্থ হয়, অফিস-আদালত ব্যবসা-বাণিজ্য তথা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ভাষা হ'তেও।

এবার নব্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষা বা নবীন যুগের সংস্কৃত থেকে বাঙালা ভাষার জন্ম কি না—তা দেখা দরকার।

৫

বাঙালা-ভাষার উৎস

বাঙালা-ভাষার উৎপত্তি নিয়ে বাঙালী-অবাঙালী, দেশী-বিদেশী 'আলেম'দের

মতামত কি, এখন তা আলোচনা করা জরুরী।

ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা" বইয়ে লিখেছেন—"ভারতের ভাষাগুলো চারটা মুখ্য ও স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে"। তাঁর মতে সেগুলো হ'ল—

"১. আর্য্য গোষ্ঠী
২. দ্রাবিড় গোষ্ঠী
৩. অস্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠী ও
৪. ভোট্-চীন বা তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠী।

'বাঙালা'—আর্য্য "গোষ্ঠীর একটী বড় শাখা।"

ড. চট্টোপাধ্যায়, অবশ্য তাঁর "বাঙলা ভাষার কুলজী" প্রবন্ধে সুর একটু নরম ক'রে ব'লেছেন—'বাঙলা-ভাষা অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্য-ভাষা।'

অন্যদিকে স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন সারা উপমহাদেশের সমস্ত ভাষা জরীপ ক'রে ব'লেছেন—"Modern Aryan languages were not derived from Sanskrit".বরং তাঁর মতে—"মধ্য দেশীয় ভারতীয় সংস্কৃত দিয়ে মারাঠী, বাঙালা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা আক্রান্ত হয়নি।" তাঁর কথায়—...."remain unaffected in their essence by the speech of the Midland" তাঁর এ-বক্তব্যের সমালোচনায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—"It is quite an interesting history how Bengali was evolved and how it became the dominating speech of various tribes and races .....who were once keen in maintaining their tribal integrity by living apart from one another, over the vast area of eighty thousand square miles"

এরপর তিনি লিখেছেন—"Bengali is called a Sanskritic language by some philological scholars, but what these scholars definitely mean by the term Sanskrit is not always explicitly stated . I consider, however, safer to call the Bengali speech an Aryan vernacular".

বাঙালা ভাষার উৎপত্তি নির্ণয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর "বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্তে' লিখেছেন—"বাঙ্গালা' ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা। স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়াছেন। ডক্টর সুনীতি কুমার

চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন।.... জননী হইতে যেমন কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেই রূপ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা জন্মিয়াছে, এইরূপ মত কেহই পোষণ করিতে পারেন না, কারণ ভাষা প্রবাহের মধ্যে আমরা "বাঙ্গালার পূর্বে অপভ্রংশ তাহার পূর্বে প্রাকৃত যুগ দেখি।.... সুতরাং দেখা যাইতেছে-সংস্কৃতের সহিত বাঙালার কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই।"]

এ জন্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে—"বাঙ্গালাকে মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলা চলে না।" তাঁর মতে—"গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর গৌড়ী অপভ্রংশ। এই গৌড়ী অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি।"

গৌড়ী-অপভ্রংশ থেকে বাঙালা ?

এই পরিপ্রেক্ষিতে, এবার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-নির্দেশিত **'গৌড়ী প্রাকৃত' থেকে বাঙালা ভাষার উদ্ভব কিনা,** তা দেখা যেতে পারে। বলা দরকার যে, এ-বিষয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে বাঙালার উদ্ভব' ব'লেও মত প্রকাশ ক'রে গেছেন। সেই ধারায় ড. কাজী দীন মোহাম্মদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতানুসারী বলা যায়। এ-ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় ভাষাতাত্ত্বিকদের একটি বড় স্ববিরোধ লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না। তাহ'ল—যাঁরা "নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা" থেকে আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলোর উৎপত্তি ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন; তাঁরাই আবার. 'প্রাকৃত' বা 'অসংস্কৃত' ভাষা থেকে আধুনিক ভাষাগুলো-(যেমন বাঙালা, আসামী, উড়িয়া, ইত্যাদি)র উৎপত্তি ব'লেছেন। কেন, তা ব'লেছেন, কেউ জানে না। 'প্রাকৃত'- ভাষা আর 'আর্য' ভাষা যে, এক নয়; তাতে কারো দ্বিমত নেই। তথাপি এই প্রশ্ন কুত্রাপি তোলা হয়নি যে, আসল ব্যাপার কি? আসল ব্যাপার যে, একটি শুভংকরের ফাঁকি—তা ঠিক। একটি কাল্পনিক ব্রাহ্মণ্যবাদী বা আর্যত্ববাদী ভাষা-অবকাঠামো দাঁড় করাতে গিয়েই 'মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা'র পর একটি 'নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা'-স্তর কল্পনা ক'রতে হ'য়েছে। কিন্তু সে-কাঠামোটা বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংগত ছিল বিধায় আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাগুলো নানা 'প্রাকৃত' ভাষা থেকে উদ্ভূত ব'লে দেখানো হ'য়ে থাকে। এ-ক্ষেত্রেও, কথা হ'ল—'প্রাকৃত'একটি ভাষা-বিশেষের নাম ব'লে মনে হ'লেও, মুলতঃ তা নয়। ব্রাহ্মণরা নিম্নস্তরের জনমানুষকে যেমন 'ইতরজন' বলেন (যেমন মিষ্টান্ন মিতরজনাঃ); সেই রকম তাদের ভাষাকেও বলেন 'ইতর ভাষা'। আর এই 'ইতর ভাষা' বা 'লোক-ভাষা' হ'ল—সর্ব যুগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লিখিত ও কথিত 'প্রাকৃত ভাষা'। কিন্তু **এই 'প্রাকৃত' ভাষা থেকেও বাঙালা ও অন্যান্য আধুনিক ভাষার জন্ম হয়নি**। কারণ ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ প্রাকৃত স্তরের পরবর্তী ভাষান্তরকে 'অপভ্রংশ'

বা 'অবহট্‌ঠ' ব'লেছেন। তাঁদের-ই নির্দেশিত এই ভাষান্তর 'প্রাকৃত' অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট স্তর। গৌড়ে লোক-ভাষার উন্নত 'সাহিত্যিক' রূপটির ভাষাকে 'প্রাকৃত' ব'লে ধ'রে নিলে; তা পাল যুগের-ই সৃষ্টি। পরবর্তীকালে তা ধ্বংস হ'য়ে, সেন-বর্মন আমলে সৃষ্টি হয়—অপভ্রংশ স্তরের বোল-বুলি। একেই বিদ্বানরা অপভ্রংশ ভাষা ব'লেছেন। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল', 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি সংকলনে এর বেশ কিছু নজীর র'য়েছে। উত্তরকালে চতুর্দশ শতকে গৌড়-বাঙালায় যে, এই ভাষার সঙ্গে আরবী-ফারছী-তুর্কী শব্দ, বাক্য, পদ গঠন-পদ্ধতি মিলিয়ে বাঙালা ভাষার সৃষ্টি হয়; 'শূন্য পুরাণে'-ধৃত "কলিমা জাল্লাল" ও "নিরঞ্জনের রুষ্মা" তার বিশিষ্ট প্রমাণ। এখন একটি ভাষা থেকে আর একটি ভাষার জন্ম হয় কি ভাবে, তা বোঝা দরকার। একটি বাঁশ থেকে যেমন আর একটি বাঁশ জন্মায়, একটি ডাল থেকেও জন্মায় আর একটি ডাল—সে রকম ভাবে একটি ভাষার শরীর থেকে আর একটি ভাষার জন্ম হয় না। নতুন ভাষার জন্ম হয়; নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে, নতুন প্রয়োজনে। হিন্দুস্তানে ও বাঙালায় মুছলিম আমলে মুছলিম রাজনৈতিক শক্তি; সেই পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রয়োজন সৃষ্টি করে। আর তার ফলেই তাদের ভাষার সঙ্গে স্থানীয় বোলবুলি মিলিয়ে-মিশিয়ে নিজেদের ভাষার চরিত্র-অনুযায়ী তাঁরা গ'ড়ে তোলেন—সারা হিন্দুস্তানের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা। বাঙালাও সে-ভাবেই তৈরী হয়। তাই বাঙালীর বাঙালা ভাষা যে, কোন প্রাকৃত, অপভ্রংশের 'সন্তান' নয়; সেকথা সত্য। তা, আজ আমরা না-জানলেও সতের-আঠারো শতকের মুছলিম কবিগণ জানতেন। কবি আবদুল হাকিম (১৭শতক) পরিষ্কার ক'রে লিখে গেছেন—আরবীর তনয় ফারছী; আর ফারছীর "নন্দন" বাঙালা। তাই উদ্ভবকাল থেকেই বাঙালা ভাষা "ফারছী-বাঙালা" নামে পরিচিত ছিল। সেকথা শাকের মামুদ, রাজা রাধাকান্ত দেব, স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন-এর লেখা থেকে জানা যায়। বাঙালা ভাষার প্রকৃত উদ্ভব ও বিকাশ যে, চতুর্দশ শতক থেকে—সে-ধরনের সন্দেহ ইতোপূর্বে ড. সুকুমার সেন ও ড. দীনেশচন্দ্র সেনও ক'রেছেন।*

প্রকৃতপক্ষে, বাঙালা-ভাষা নিশ্চিত রূপেই একটি 'নতুন হিন্দুস্তানী ভাষা' বা 'নব্য ভারতীয় ভাষা'। এ-ভাষার উৎস ইউরোপে নয়। এশিয়ায়। বাঙালা-ভাষা পষ্ট ভাবেই তথাকথিত 'সেমিটিক' খানদানের ভাষাগুচ্ছের-ই আওলাদ। বিশ্বপরিসরে, বাঙালা-ভাষার ঐতিহাসিক ধারাপ্রবাহ তাই নিচের ছক** অনুযায়ী দেখানো উচিত।

অতএব, পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়—বাঙালা ভাষার আদি উৎপত্তি 'বাঙালী' মুছলিম জনকওমের আদি উৎপত্তির সাথে জড়িত। তবে, পূর্ব-

* ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-১ম খণ্ড, (ঢাকা-২০০৪), পৃষ্ঠা-১০৪-১২৬।

** ছকটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

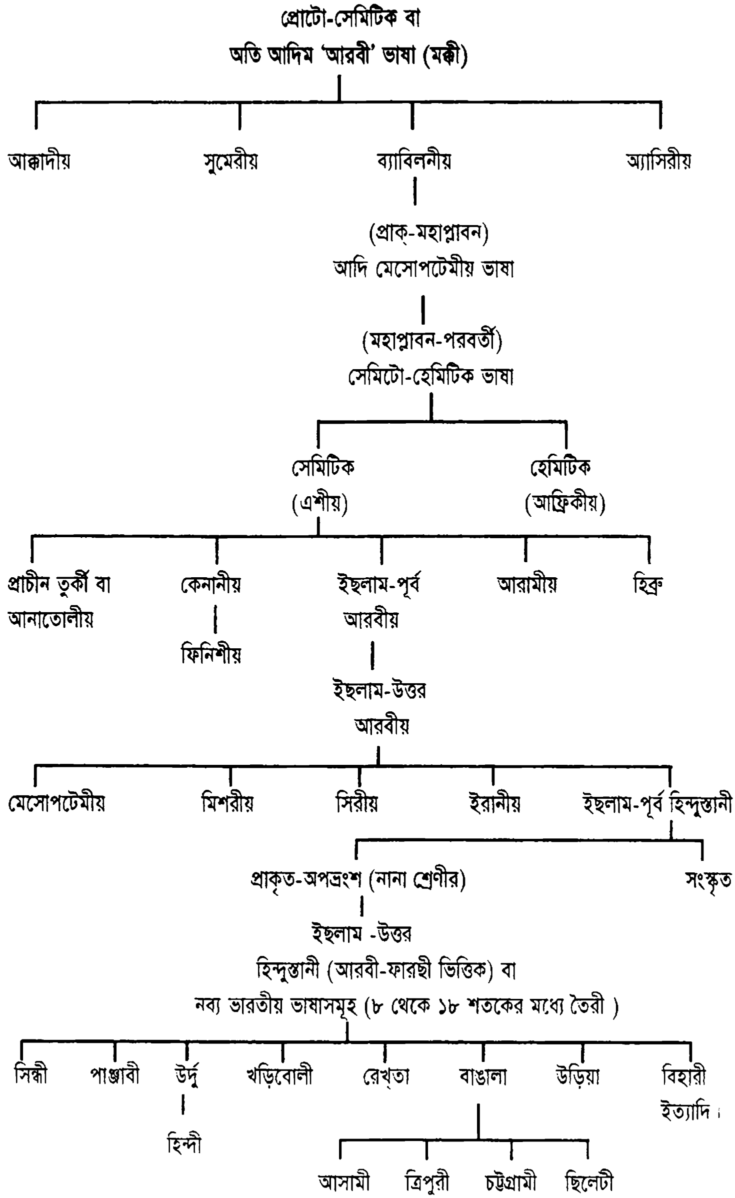
প্রোটো-সেমিটিক বা
অতি আদিম 'আরবী' ভাষা (মক্কী)
আক্কাদীয়
সুমেরীয়
ব্যাবিলনীয়
অ্যাসিরীয়
(প্রাক্-মহাপ্লাবন)
আদি মেসোপটেমীয় ভাষা
(মহাপ্লাবন-পরবর্তী)
সেমিটো-হেমিটিক ভাষা
সেমিটিক
(এশীয়)
হেমিটিক
(আফ্রিকীয়)
প্রাচীন তুর্কী বা
আনাতোলীয়
কেনানীয়
ফিনিশীয়
ইছলাম-পূর্ব
আরবীয়
আরামীয়
হিব্রু
ইছলাম-উত্তর
আরবীয়
মেসোপটেমীয়
মিশরীয়
সিরীয়
ইরানীয়
ইছলাম-পূর্ব হিন্দুস্তানী
প্রাকৃত-অপভ্রংশ (নানা শ্রেণীর)
সংস্কৃত
ইছলাম -উত্তর
হিন্দুস্তানী (আরবী-ফারছী ভিত্তিক) বা
নব্য ভারতীয় ভাষাসমূহ (৮ থেকে ১৮ শতকের মধ্যে তৈরী)
সিন্ধী
পাঞ্জাবী
উর্দু
হিন্দী
খড়িবোলী
রেখ্‌তা
বাঙালা
উড়িয়া
বিহারী
ইত্যাদি।
আসামী
ত্রিপুরী
চট্টগ্রামী
ছিলেটী

পশ্চিম, উভয়ের মিলিত বাঙালায়, বাঙালা ভাষার 'জন্ম'—একাদশ শতক বা তার নিকটবর্তী কালে। আর তার অব্যাহত বিকাশ ১৮০০ সাল অবধি। তারপর আলাদা যুগের সূচনা। ১৮০১ সাল থেকে।

৬

বলা দরকার যে, স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ ওগয়রহ 'ইন্দো-ইউরোপীয় আর্য্য ভাষা'র সরাসরি আওলাদ হিসাবে 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা'-(হিন্দ-আর্য্য)র যে-তত্ত্ব, গত প্রায় এক শ' বছর প্রচার ক'রে আসছেন, এ-উপমহাদেশের কেউ তার গায়ে হাত দেননি। কারণ তাঁদের বিশাল ব্যক্তিত্ব, গভীর জ্ঞান, বিপুল খ্যাতি ও বহু ভাষাভিজ্ঞতার প্রশ্নহীন বিদ্যাবত্তার ছায়ার কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা কারও নেই। এ-লেখকেরও নয় । তাই ঐ সব মনীষীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ওপর শ্রদ্ধা রেখেই সবিনয়ে, সংসংকোচে, পূর্বালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে না ব'লে উপায় নেই যে, উপরে লিখিত মনীষীগণ **তখনকার বৃটিশ বিশ্বায়নবাদী কালচারাল 'ভাষা-প্রকল্পে'র শিকার হ'য়ে, কেবল বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক, ধ্বনিতাত্ত্বিক বা রূপতাত্ত্বিক (Structural linguistics) ভাষাবিচার ধারায় চালিত হন**। **তাঁরা এ-বিশেষ তত্ত্ব, অজ্ঞাতকাল থেকে জ্ঞাতকাল তক প্রবাহিত, ইতিহাসের তৈরী ছাঁচে ঢেলে প্রচার করেন এবং বিশ্বব্যাপী তার বিকাশ ঘটান**। কিন্তু তাঁরা এ-কথা ভেবে দেখেননি যে, ভাষা বা শব্দ কখনও জননিরপেক্ষ নয়। একটা বিশেষ ভাষা মানেই হ'ল—ঐ ভাষায় কথা-বলা একটা বিশেষ জনকওম। তাই ভাষার প্রবাহ-বিচারের সাথে জনধারার প্রবাহ-বিচার ঘনিষ্ঠতম ভাবে জড়িত। অতএব **ভাষাবিজ্ঞান**-এর আলোচনার সাথে **নৃবিজ্ঞান**-এর ও **সমাজতত্ত্ব**-এর এবং জাতি বিশেষের **রাজনৈতিক আধিপত্য** আর **সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব** বা বিজয় লাভের প্রশ্নগুলোও অপরিহার্যভাবে জড়িত। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ভাষা-বিচারের সঙ্গে নৃতত্ত্বের সম্পর্কের উল্লেখ ক'রলেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশকে মানব জাতির উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সর্বত্র মিলিয়ে নিতে পারেননি। এজন্য তাঁর আলোচনাও সমকালীন রূপতত্ত্ববাদী (Structural) ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌দের **শুদ্ধতাবাদে** পরিণত হ'য়েছে। বিশ্ব-পরিসরে গত পঞ্চাশ বছরে নৃতাত্ত্বিক চিন্তাধারা—আলোচনা-গবেষণা ও তথ্য-আহরণে যে বিপুল উন্নতি ও বিকাশ ঘ'টিয়েছে; আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরীগণ তার সাথে পরিচিত হ'তে পারেন নি। ফলে, **তাঁদের আধুনিক কালের 'কালচারাল অ্যানথ্রোপলজি'র উপহারীয় তথ্য-ব্যবহারের সুযোগ না থাকায়, তাঁরা**

এমন এক কাল্পনিক ঐতিহাসিক বিশুদ্ধ ভাষা-বিজ্ঞান ও বিশ্বভাষা-প্রকল্প তৈরী **ক'রেছেন; যা পরিচিত সময়কে অপরিচিত ও অপরিচিত কালকে অতিশয় আলোকিত ক'রে তুলেছে। ইতিহাসকে তাঁরা যদি অবরোহ পদ্ধতিতে** তৈরী **না ক'রে, আরোহ পদ্ধতিতে খোঁজার কোশেশ** ক'রতেন; তাহ'লে যে, অন্য রকম খবর পেতেন—তা বেশক বলা যায়।

ফলে, আজকের আমেরিকান-বিশ্বায়নের আমলে পুরানো মতি-মর্জির নতুন চেহারার (New conservatism))মোকাবেলায় নয়া বিশ্বভাষা-প্রকল্পের তত্ত্ব-তালাস করা জরুরী। একুশ শতকের চাহিদা মেটাতে তাই নয়া প্রকল্প রচনাকারীদের বাঙালা ভাষাসহ দুনিয়ার তাবৎ ভাষার শুধু **একক রূপ** নয়—**গুচ্ছ রূপেরও** খোঁজ ক'রতে হবে। আর তা ক'রতে হবে—ইতিহাসের **অবরোহ** পদ্ধতিতে নয়; **আরোহ** তরতিবে। **কল্পনার** পাখায় ভর ক'রে নয়; **বাস্তব** ও দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাই আধুনিক ভাষা-তাত্ত্বিকদের এখন 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' (Historical Materialism) ও 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'-(Dialectical Materialism)এর বিচারধারায় আলোকিত ক'রতে হ'বে—একুশ শতকের বিশ্বভাষা-প্রকল্পের নানা রকম **দেশীয়** ও **আন্তর্জাতিক** 'একক' এবং 'গুচ্ছরূপ'কে। কারণ সারা দুনিয়ার সকল ভাষার একটি মাত্র ভাষা-উৎসের আভাস পাওয়া গেলেও স্পষ্ট প্রমাণ এখনও মেলেনি। অপরদিকে, হাল আমল তক মহাদেশীয় ভিত্তিতে নানা জনকওমের নানা ভাষার একক রূপ ও গুচ্ছ রূপ—উভয়ের-ই খোঁজ পাওয়া গেছে। নজীর হিসেবে বলা যায়—১৯৫৪ সালের একটি গবেষণার বরাত দিয়ে নৃবিজ্ঞানী রবার্ট বি. টেইলর জানিয়েছেন—'বর্তমান দুনিয়ার নব্বই ভাগ লোক ন'টি ভাষা-পরিবারের আওতায় থেকে কথা বলে'। তিনি আরও ব'লেছেন—'সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায়—'উত্তর আমেরিকায় আছে ৭৩টি ভাষা গুচ্ছ বা 'ভাষা-পরিবার'। সেগুলোর মধ্যে ৩১টাই গুচ্ছহীন বা একক। অপর দিকে, দক্ষিণ আমেরিকায় আছে ৮০ টি ভাষাগুচ্ছ বা 'ভাষা-পরিবার'; এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়াতেও যে এরকম আছে—তা কবুল না ক'রে উপায় নেই। এমনকি, আজকের ভারতেরও সব ভাষা জরীপ ক'রলে, সেগুলোর মাঝে একক ও গুচ্ছ 'ভাষা-পরিবারে'র নজীর মিলবে।

অতএব, এখন আর **বিশুদ্ধ কল্পনা-নির্ভর** বিশুদ্ধ রূপতাত্ত্বিক **(Structural) ভাষাবিজ্ঞান চর্চা ও যুগ-প্রকল্প-নির্মাণের সময়** নেই। পুরানো

কল্পনা বাঁচিয়ে রাখারও সুযোগ নেই।

একুশ শতকের ভাষাতাত্ত্বিকদের, যে-কোন ভাষার ঐতিহাসিক ধারা-প্রবাহ দেখাতে তাই—এখন নজর দিতে হবে, মাকর্সীয় বিচার-পদ্ধতির দিকে। তাঁরা যে-কোন ভাষার-ই কুলজী নির্ণয় করুন কেন; তা করার সময় ঐ **ভাষার সাথে** ঐ ভাষাভাষী **জনকওমেরও** কুলজী খুঁজতে হবে। এখন আর কোন ভাষা-বিচার—বিশুদ্ধ 'ভাষা-তাত্ত্বিক', 'রূপতাত্ত্বিক' বা 'ধ্বনিতাত্ত্বিক' আলোচনার ছায়ায় করা চলে না। **এখন প্রত্যেকটি ভাষা-বিচারকালে দেখতে হবে—'ভাষা'র সাথে 'জাতি'কে মিলিয়ে**। এ-তরফে বিবেচনা ক'রতে হবে—

১. 'জাতিগত শক্তি'র সাথে 'জাতিগত দুর্বলতা'।

২. 'জাতিগত সামরিক-রাজনৈতিক বিজয় ও আধিপত্যে'র সাথে 'জাতিগত সামরিক-রাজনৈতিক পরাজয় ও আত্মসমর্পণ।

৩. 'বিজয়ী জাতি'র শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-লিপি ইত্যাদির 'আগ্রাসনের' সাথে 'বিজিত জাতি'র শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-লিপি ইত্যাদির 'বিবর্তন-পরিবর্তন'।

৪. ঐ পরিবর্তনের প্রকৃতি 'ধীর' না 'দ্রুত' এবং 'স্বাভাবিক' না 'আকস্মিক'—তাও বিবেচ্য।

এ-সব বিষয়ের দিকে নজর রেখে, যদি নতুন বিশ্বায়ন-বিরোধী **বিশ্বভাষারাজির 'একক' ও 'গুচ্ছরূপে'র গণমুখী ধারা** খুঁজে পাওয়া যায়—তবে তা-ই হবে—একুশ শতকের আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের মূল্যবান অবদান। তাহ'লেই বাঙালাসহ সারা বিশ্বের-ই সকল ভাষা খুঁজে পাবে যথাযথ আত্মপরিচয়। এ-ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা ও কম্পিউটারের প্রয়োগ ১৮-১৯ শতকের কাল্পনিক ভাষা-প্রকল্প ও যুগ-বিভাগের অযৌক্তিকতা আরও ভাল ভাবে ফুটিয়ে তুলবে।

গ্রন্থপঞ্জী

ক. আরবী

১. আল্ কোরআন

খ. ইংরেজী

1. P. N. Khanlari. Translated by Dr. N.H. Ansari.	A History of The Persian Language- Vol.1, New Delhi-1979.
2. S.K. Chatterjee	Origin And Development of The Bengali Language. Vol. 1-3. Rupa, New Delhi, Cal.-1985.
3. B. C. Mojumdar	The History of the Bengali Language. Second Edition. C.U.1927.
4. Kroeber	Anthropology. New Delhi-1972.
5. Morton Klass and Hal Hellman	The Kinds of Mankind. New York-1971.
6. Franz Boas.	The Mind of Primitive Man. New York-1966.
7. Ashley Montagu.	Man's Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race. New York-1965.
8. Robert B. Taylor	Cultural Anthropology. Boston-1973.
9. Raymond Scupin Christopher R. Decorse	Anthropology. New Jersey-1948.
10. M. Winternitz	A History of Indian literature. Vol. 1,part 1. Third Edition, New Delhi, 1907.
11. William C. Boyd.	Genetics and The Races of Man. Boston-1950.
12. Sir Jeraled Barry Dr. J. Gronovosky James Fisher Sir Julian Huxly.	Communication and language. (Networks of Thought and Action)
13. Greenberg	Anthropological Linguistics : An Introduction. New York -1968.
14. Safder Alladina Viv Edwards.	Multilingualism in the British Isle 2 Africa, the Middle East and Asia. Longman, U.K.-1991.
R. H. Robins	A Short History of Linguistics. Second Edition. Longman. U.K-1979

গ. বাঙালা

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ — বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ঢাকা-২০০২।

২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ — স্মারক গ্রন্থ বাংলা একাডেমী-১৯৮৫।

৩. মুহম্মদ আবদুল হাই — রচনাবলী-২য় খণ্ড বাংলা একাডেমী-১৯৯৪।

৪. ড. কাজী দীন মোহাম্মদ — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খণ্ড, ঢাকা-১৯৬৯।

৫. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ক.বি.-১৯৭৪।

৬. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে, কলি (?)

৭. গোলাম আহমাদ মোর্তজা — চেপে রাখা ইতিহাস, কলি.

৮. গোলাম আহমাদ মোর্তজা — বজ্রকলম-১মখণ্ড, কলি-১৯৯৯।

৯. ড. ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত — সাহিত্যে প্রগতি, কলি.১৯৪৫।

১০. ড. এস.এম. লুৎফর রহমান — বাঙালীর লিপি-ভাষা-বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস-১ম খণ্ড, ঢাকা-২০০৪।

১১. ড. এস.এম. লুৎফর রহমান — ব্রজুবলী কি বৃন্দাবনের ভাষা, না বাঙালা ভাষা? সাহিত্য পত্রিকা, ৪৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ২০০৪।

১২. মোশাররফ হোসেন খান — বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, ঢাকা- ১৯৯৮।

১৩. শোভা চট্টোপাধ্যায় — প্রাচীন যুগের ইতিহাস লেখার নেপথ্য কথা, কলিকাতা।

১৪. খোন্দকার মাহমুদুল হাসান — হিব্রু থেকে ইহুদী, ঢাকা-২০০১।

১৫. বিবশ্বান — মিথ্যাময় ইতিবৃত্ত, কলিকাতা।

১৬. প্রসূন বসু ও শচীন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত — বিবেকানন্দ রচনা-সংগ্রহ ৩য় মুদ্রণ, কলিকাতা।

১৭. শঙ্করী প্রসাদ বসু — বিবেকানন্দও সমকালীন ভারতবর্ষ, কলিকাতা।

১৮. এ.সি. মূর হাউস — রাইটিং অ্যাণ্ড দি অ্যালফাবেট্ (বাঙালায় অনুবাদ) কলি-১৪০২।

১৯. আ. ত. ম. মোছলেহ উদ্দীন — আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় সং ঢাকা-২০০৩

২০. রামাই পণ্ডিত — শূন্যপুরাণ, কলি-১৩৩৬।

২১. রামাই পণ্ডিত — ধর্ম্মপূজা-বিধান, কলি-১৩৩২।

২২. মিখাইল নেস্তূর্খ — মানব-সমাজ, মস্কো-১৯৭৬।

২৩. মওলানা আবুল বাশার জিহাদী — ইসলামের সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন- ১ম খণ্ড ঢাকা-১৯৯৬।

২৪. আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল্ মান্নান — ইসলামের সভ্যতার বিস্ময়কর নিদর্শন-২য় খণ্ড ঢাকা-১৯৯৯।

ঘ. হিন্দী

১. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী — সত্যার্থ প্রকাশ রাজ সংস্করণ, নয়া দিল্লী, ভারত।